পৃথিবী কা'দের

ও অন্যান্য গল্প

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

তৃতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস,
৭৩, মানিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

এক টাকা আট আনা

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

পাণিবন্ধেষু

স্থচি

পৃথিবী কাঁদের ?

একেবারে উঠানের উপরে বীজতলা ; সেইখানে ধান বুনেছে। নূতন বর্ষায় ধানচারার রঙ হয়েছে মেঘের মতো কালো। নটবর লাঙ্গল নিয়ে ক্ষেতে যাবার সময় দেখে, ক্ষেত থেকে ফিরে এসে দেখে ; রাত্রিবেলা একঘুমের পর তামাক সেজে যখন দাওয়ায় বসে, তখনও ঐ বীজতলার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

এরই মধ্যে একদিন সর্দি করে একটু জ্বর হয়েছে সৌদামিনীর। আর যাবে কোথায় ? নটবর বলে, হুঁ হুঁ—বুঝতে পেরেছি ! ঘর তো নয়—এ হয়েছে যেন তেঁতুলতলা। বাইরের বৃষ্টি বন্ধ হয়, তেঁতুলতলার বৃষ্টি থামে না। রোসো—

ক্রোশ পাঁচেক দূরে ভদ্রার ও-পারে পিশ-শ্বশুরের বাড়ি ; তাদের অবস্থা ভাল। নটবর ছুটল সেখানে। বলে, তিন কাহন খড় দিতে হবে গো পিশেমশাই। মেয়ে তোমাদের নবাব-নন্দিনী। গায়ে ফোঁটা দুই জল লেগেছে, সেই থেকে বিছানা নিয়েছেন—

পিশে একটুখানি ইতস্তত করতে নটবর বলল, ডরাচ্ছ কেন গো ? এই চারটে মাস দেরি কর—তোমার ঐ তিন কাহনের জায়গায় আর এক

কাহনের বেশি দাম ধরে দেব। জমিদার এবার লকগেট করে দিয়েছে, আমার বাইশ বিঘে জমিতে সোনা ফলবে। আর কিছু ভাবনা করি ?

ক্ষেতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নটবর মটকায় উঠে ঘর ছায়। নিচে থেকে সৌদামিনী খড়ের আটি ছুঁড়ে দেয়। খড় সে অবধি বড় পৌছায় না, নটবরের কাছেও যায় না, গড়িয়ে আবার নিচে এসে পড়ে। নটবর বলে, এই তোর হাতের ঠিক ? কোন কামের ন'স রে বউ, তোরা পারিস কেবল বেগুন কুটতে। তাক করে ফেল্ দিকি—

খুব মনোযোগের সঙ্গে বউ তাক করে। খড় পড়ে এবার চালের উপর নয়—নটবরের পিঠের উপর।

উহু—হুঁ,···এই ?

বউ হেসে গড়িয়ে পড়ে। নটবরের ইচ্ছে করে, নেমে এসে ঐ পাগলীকে ধাক্কা মেরে জল-কাদার মধ্যে ফেলে দেয়। সেখানে গড়িয়ে গড়িয়ে হাস্থক —যত পারে, হাস্থক—

নূতন ছাউনিতে ঘরখানা ঝকমক করে। নটবর দাওয়ায় শোয়। রাতের বাতাসে ধানচারার নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পায়। লাল ভেরেণ্ডা-ঘেরা উঠানের ফালির মধ্যে গাদাগাদি হয়ে তারা আর থাকতে চাইছে না, সীমাহীন বিলে যাবার জন্য অধীর হয়েছে। আপন মনে মাথা নেড়ে হাসিমুখে নটবর বলতে থাকে, সবুর, সবুর—মাটি ভেঙে তোদের জন্য গদি তৈরি হচ্ছে। হয়ে যাক—সব্বাইকে নিয়ে যাব—সবুর—

এক-একদিন ঘুমের ঘোরে নটবর চমকে ওঠে, মাঝরাতে বৃষ্টি নেমেছে, ঝড়ো বাতাসে জলের ছাট সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। একটুখানি সরে সে আগুনের মালসার কাছে বসে। ভুড়-ভুড় করে হুঁকো টানে, আর ভাবে —সকালটা হলে হয়, উঃ কত রাত্রি এখনও !

বিছানাটা বেড়ার দিকে টেনে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। ঘুমোবার জো আছে! তখনই ধড়মড় করে ওঠে। ফরসা তো প্রায় হয়েই গেছে। জোরে জোরে সে দরজা ঝাঁকায়। ওঠ্, শিগগির ওঠ্,—ও বউ, মরে ঘুমুচ্ছিস নাকি? উঠে বোঁদাটা ধরিয়ে দে না—

চোখ মুছতে মুছতে সৌদামিনী দরজা খুলল। নটবর ততক্ষণে গোয়াল থেকে বলদ বের করেছে, লাঙ্গল কাঁধে নিয়েছে। সৌদামিনী বলে, কি ভূত চাপল তোমার ঘাড়ে—দুই চোখ এক করতে পার না। রাত যে এখনো এক প'র বাকি—

হুঁ, রাত না হাতী! আকাশের দিকে চেয়ে নটবর কিন্তু একটু বেকুব হয়ে গেল। রাত পোহায় নি সত্যি। চাঁদ জ্বল-জ্বল করছে; মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না দিনের মতো লাগছে। নটবর বলল, কি বৃষ্টিটা হয়ে গেল! কিচ্ছু তো জানলি নে বউ, তুই তখন নাক ডাকছিলি। আমার ধানচারা আজ এক বিঘত বেড়ে গেছে।

নালা দিয়ে কলকল শব্দে জল বেরুচ্ছে। নটবর হাল-গরু নিয়ে মাঠে নামল। শখ করে বলদের গলায় ঘণ্টা বাঁধা হয়েছে, ঘণ্টার ঠুন-ঠুন শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে গেল। কাদায় ভর্তি উঠান পেরিয়ে ভেরেণ্ডার বেড়ার ধারে সৌদামিনী কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবল, বেশ হয়েছে, আর শোব না, কাজ-কর্মগুলো এইবার সেরে রাখি। গোবর-মাটি দেওয়া হল, ঘর-দোর ঝাঁট হয়ে গেল, রাত আর পোহাতে চায় না। তার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। মানুষটি কি রকম হয়ে গেছে —ক্ষেত আর ক্ষেত! রাত-বিরেতে একলা একটি প্রাণী বেরিয়ে যায়, কত রকম দোষ-দৃষ্টি পড়তে পারে, বুনো-শূয়োর কি সাপ—

সাপের কথা মনে হতে সৌদামিনী শিউরে ওঠে। আস্তিকস্য মুনের্মাতা··· হে মা মনসা, রক্ষা কোরো—

ঐ ধানক্ষেতের উপরেই সাপের কামড়ে নটবরের বাপ মারা গিয়েছিল। সে অনেকদিনের কথা, আবাদের জঙ্গল সাফ হচ্ছিল।··· সৌদামিনী এ বাড়িতে আসে নি, নটবর তখন এক ফোঁটা শিশু। সেই সব কাহিনী নটবর যখন বলে, সৌদামিনীর চোখে জল এসে যায়।

এরই মধ্যে একদিন রান্নাঘরে বসে সৌদামিনী ক্ষেতে পান্তা পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল, এমন সময় ঢোলের আওয়াজ শোনা গেল, ডুম-ডুম-ডুম। তাড়াতাড়ি সে বাইরে এল। বাজনা আসছে মাঠের দিক থেকে। রোদ ওঠে নি ভাল করে, এখন ঢোলের বাজনা···বিয়ে করতে যাবার সময় এ নয়,—তা হ'লে বিয়ের পর বর-ক'নে ফিরে চলেছে ঠিক্।

মাঠের দক্ষিণে বাঁধাল, সেইখান দিয়ে কাঁচা রাস্তা গিয়েছে ভোমরার ভদ্রপাড়ার দিকে। সৌদামিনী দৃষ্টি বিসারিত করে সেই দিকে তাকাল। বিস্তর লোক সেখানে—চারো, দোয়াড়ি, ঘুণি পেতে নানা উপায়ে মাছ ধরা হচ্ছে। বর-ক'নের কোন পাল্কি কিন্তু নজরে এল না।

লাঙ্গল-গরু নিয়ে একটু পরেই নটবর ফিরে আসছে।

এ কি? এরই মধ্যে যে!

নটবর ম্লান হেসে বলল, কিছু না, ব্যস্ত হোস নে বউ—একটা মাদুর দে দিকি—

কি হয়েছে, বল না তুমি। বলদ দুটোর দড়ি নিজের হাতে নিয়ে সৌদামিনী কাতর চোখে চাইল।

নটবর বলল, বড্ড মাথা ধরেছে, ক্ষেতে আর দাঁড়াতে পারলাম না।

দাঁড়াবার জো ছিল না সত্যি। সৌদামিনী বিছানা করে দিল; নটবর শুয়ে পড়ে সেই যে চোখ বুজল, সমস্তটা দিনের মধ্যে আর উঠল না—খেলও না। সৌদামিনী বারবার গায়ে হাত দিয়ে দেখে, গায়ে কিন্তু জ্বর নেই।

আরও ক'দিন কাটল এই রকম। নটবরের কি যে অসুখ, সব সময়ে শুয়ে শুয়ে থাকে। ক্ষেতে ওদিকে বড় গোন লেগেছে—প্রিয়নাথ, মদন, কাসেম আলি ওরা সব সকাল-সন্ধ্যা দু-বেলা চাষ জুড়েছে। ক'দিনের বৃষ্টিতে ধানচারা আরও বেড়ে গেছে। তারপর আবার একদিন রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠে নটবর ডাকতে লাগল, ও বউ, শিগগির ওঠ্—উঠে বোঁদাটা ধরিয়ে দে এট্টু।

রাত দুপুরে নটবর ক্ষেতে যায়, ভোর না হতে ফিরে আসে। সৌদামিনী আর পারে না, হাত দু-খানা ধরে একদিন জিজ্ঞাসা করল, কিছু হয়েছে তোমার? সত্যি কথাটা বল দিকি—

কিছু না, কিছু না। নটবর কথাটা উড়িয়ে দেয়। রোদ লাগলে মাথা ধরে যে! রাতারাতি না চষে উপায় কি?

সন্ধ্যার পর সৌদামিনী ভাত বেড়ে দিয়ে সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। কেরোসিনের টেমি জ্বলছে। দু-চার গ্রাস মুখে দিয়ে নটবর ফিক করে হেসে উঠল। বলে, বউ, একেবারে যে মহা-মচ্ছব ব্যাপার! রোজ রোজ এ তুই আরম্ভ করলি কি?

ব্যাপার গুরুতর বটে। ডাল এবং শাকের ঘণ্টের উপর খেজুর-গুড়ের পায়স দিয়েছে। সৌদামিনী গাই দুইতে পারে ভাল। হরি চাটুজ্জের বেয়াড়া গরু কেউ সামলাতে পারে না, আজ সৌদামিনী দুয়ে দিয়ে এসেছে। সেখান থেকে দুধ পেয়েছে, এবং দুধ যখন পাওয়া গেল—ঘরে গুড় রয়েছে—আগুনে একটু সিদ্ধ করা বই তো নয়! কিন্তু এত সব কৈফিয়ৎ দেবার মেয়ে সৌদামিনী নয়। সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, দেখ, মানা করে দিচ্ছি—আমি গিন্নি, আমার ঘর-সংসার। তুমি কেন আমার সংসারের কুচ্ছো করবে?

হাসতে হাসতে নটবর বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, আর করছি নে। কিন্তু একটা কাজ কর্ বউ, আগে ঐ আলোটা নিভিয়ে দে। মাছ নেই যে কাঁটা বেছে খেতে হবে। এত রোসনাই করলে লাটসাহেবও যে ফতুর হয়ে যায়!

সৌদামিনী তাড়া দিয়ে ওঠে, আবার!

হতাশ স্বরে নটবর বলে, বেশ, কিন্তু আবার যে কাল বলবি এক পয়সার কেরোসিন কেনো—

কাল বলব না, পরশুও না। তুমি চুপ কর দিকি। অত বকবক করলে খেয়ে কখনো পেট ভরে!

বাঁশ-বাগানের ফাঁক দিয়ে উঠানে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না পড়েছে। নটবর এক এক গ্রাস খায় আর ভাবে, নাঃ—মেয়েমানুষের মতো বেহিসাবি জাত আর নেই। এই তো চাঁদের আলো পড়েছে, কি দরকার ছিল কেরোসিন পুড়িয়ে নবাবি করবার!

হঠাৎ কুকুর ডেকে ওঠে। নটবর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথের দিকে চাইল। সৌদামিনী বলে, কিছু না, তুমি খাও—

হাত গালে ওঠে না।

সৌদামিনী ব্যাকুলকণ্ঠে বলল, ওকি, উঠছ যে! শেয়াল-টেয়াল কি হয়তো যাচ্ছিল। তুমি বোসো, আমি দেখে আসছি—

টেমির কেরোসিন অকারণে ব্যয় হতে লাগল—লাটসাহেবের অপব্যয়! কিন্তু নটবরের সেদিকে দৃষ্টি নেই। দূরের অন্ধকারের সুঁড়ি-পথের দিকে সে তাকিয়ে আছে।

ফুঃ ফুঃ—

আলো নিভিয়ে এক ঝটকায় সৌদামিনীর হাত ছাড়িয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাছারির মাণিক বরকন্দাজ উঠানে এসে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক উঁকি মেরে সে বলে উঠল, কোথায় গো ?

বাড়ি নেই।

ভেগেছে ?

পিঁড়ি টেনে নিয়ে ধীরে সুস্থে মাণিক দাওয়ায় উঠে বসল। আপন মনে বকাবকি করে, আঁধারে ভূতের মতো এসেও দেখা পাবার জো নেই—মানুষ কম শয়তান হয়েছে আজকাল! তারপর সৌদামিনীকে বলে, আলো জ্বাল না গো, ভালমানষের মেয়ে···এই তো জ্বলছিল এতক্ষণ।

আলো জ্বেলে দিয়ে সৌদামিনী নিরুত্তরে রান্নাঘরের দিকে চলল।

মাণিক হি-হি করে হেসে উঠল, তা নটবরের দিনকাল যাচ্ছে ভাল ; পিঠে-পায়েস—যেন যজ্ঞির বাড়ি। শোন গো লজ্জাবতী ঠাকরুন, নতুন হাঁড়ি নিয়ে এস—আর চাল-ডাল কাঠ-কুটো—

সৌদামিনী ফিরে দাঁড়াল। মাণিক বলে, রান্না-খাওয়া আজকের এইখানে হবে। তারপর একটা মাদুর দিও, পড়ে থাকব। হুজুরের দেখা তো সহজে মিলবে না!

গোবরমাটি দিয়ে পরম যত্নে নিকানো দাওয়া—সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়। বলা নেই, কওয়া নেই—খন্তা এনে মাণিক নির্মমভাবে দাওয়া খুঁড়তে লাগল। সৌদামিনীর পাঁজরে যেন সেই খন্তার কোপ পড়ছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল, কি হচ্ছে ?

উনুন খুঁড়ছি। তুমি আর দাঁড়িও না গো, সিধের উয্যুগ করগে—

ঘরের পিছনে বাঁশতলায় বড় উনুন। শীতকালে খেজুর-রস জ্বাল দেওয়া হয় ; এখন ঝরা বাঁশপাতায় প্রায় ভর্তি হয়ে আছে। চারিদিকে আশশ্যাওড়া ও ভাঁটের জঙ্গল ; উনুন বলে ধরবার জো নেই। সৌদামিনী নিচু হয়ে দু-হাতে বাঁশের পাতার স্তূপ তুলতে লাগল।

বলি, বেঁচে আছ—না সাপ-খোপে দয়া করেছে?

সাড়া পাওয়া যায় না।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সৌদামিনী বলল, উঠে এস বলছি। তুমি চোর না ডাকাত—যে উনুনে সেঁদিয়ে থাকবে? বরকন্দাজ কি লাগিয়েছে দেখ, আমার ঘর-দোর খুঁড়ে তছনছ করছে।

নটবর ফিসফিস করে বলল, চুপ! মেজাজ দেখাস নে বউ, তিন বছরের খাজনা বাকি, জানিস?

মাণিক হুঁসিয়ার লোক, তারও এই রকম গোছের একটা সন্দেহ ছিল। সে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলে উঠল, কে রে? উনুনের মধ্যে কথা বলে কে?

আতঙ্কে ঢুকে পড়া যত সহজ, বেরিয়ে আসা তেমন নয়। নটবর নানারকমে চেষ্টা করে। বলে, হবে, হয়ে যাবে···ও মাণিক ভাই, অত হাসছ কেন? মাজাটা বড্ড ধরে গেছে কিনা! বউ, কাঁধের এই এইখানটা ধরে একটু টান দে দিকি···হ্যাঁ জোর করে টান দে—

অনেক কষ্টে সে বেরিয়ে এল। কাঁধের কাছে কেটে গেছে, বিছুটি লেগে সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে উঠেছে। একটুখানি হাসির মতো ভাব করে নটবর বলল, উনুনটা সাফ করছিলাম মাণিক-ভায়া। কি রকম জঙ্গল হয়েছে, দেখ।

মাণিক হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। বলল, তবু ভাল। আমি ভাবলাম বুঝি শেয়াল ঢুকেছে—

ঘাড় নেড়ে নটবর বলে, তাই, ঠিক তাই—শেয়াল-কুকুর ছাড়া কি! মানুষের ভয়ে শেয়াল গর্তে ঢোকে, আমরা গর্তে ঢুকি তোমাদের ভয়ে।

নিজের রসিকতায় খানিক সে হা-হা করে হাসে। তারপর খপ

করে বরকন্দাজের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলে, কাছারি গিয়ে বলোগে ভায়া, বাড়ি নেই। তোমার রোজ-গণ্ডা সমস্ত দিয়ে দেব।

মাণিক হাত বাড়িয়ে বলে, দাও। আমার নগদ কারবার—

আজ নয়, পরশু। হাটে দিয়ে দেব। মাইরি—আজ একটা পয়সা নেই। থাকে তো বাপের হাড়—

বরকন্দাজ বলল, তবে হবে না, মনিবের নুন খেয়ে মিথ্যে বলতে পারব না। আজ আবার ছোটবাবু এসেছেন সদর থেকে। রেগে আগুন হয়ে আছেন। চল—

দৃঢ়মুষ্টিতে তার হাত এঁটে ধরল।

ফাঁসির আসামীর মতো নটবর কাছারির হলঘরে এসে দাঁড়াল।

ছোটবাবু অল্পকথার মানুষ। বললেন, মালিকের মাল-খাজনার দায়ে তোমার জমি নিলাম হয়ে গেছে।

আজ্ঞে।

বয়নামা জারি হয়েছে, ঢোল-সহরৎ হয়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ—

নায়েব একটা হিসাব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, চশমার ফাঁকে চেয়ে বললেন, শুধু তাই নয় হুজুর, একদিন বরকন্দাজ দিয়ে লাঙল খুলে জমি থেকে তাড়িয়েও দিয়েছিলাম—

ছোটবাবু বললেন, অথচ শুনতে পাই রাত্তিরে রাত্তিরে জমি চসা হচ্ছে। বলি, মতলবটা কি ?

নায়েব টিপ্পনি কাটলেন, মতলব বোঝাই যাচ্ছে হুজুর। পেছনে ঠিক রঘুনাথ সা রয়েছে, এই বলে দিলাম। জমির দখল বজায় রাখছে।

ছোটবাবু বলতে লাগলেন, তোদের জন্যে আমি সদরে ফৌজদারি

করতে যাব না। আসবার সময় কলকাতা থেকে একখানা ভাল হাণ্টার নিয়ে এসেছি। তা-ই যথেষ্ট। দেখবি?

নটবর আকুল হয়ে কেঁদে উঠল, হুজুর বাঁধ ভেঙে তিন তিন বছর ক্ষেত ভাসিয়ে দিল—পেটে খেতে পাই নি, খাজনা দেব কোত্থেকে?

সে ছোটবাবুর পা জড়িয়ে ধরল।

এবার জমিতে বড্ড ভাল গোন; সোনা ফলবে, হুজুর। খাবার ধান যা যোগাড় ছিল, সমস্ত বীজতলায় ছড়িয়েছি। এইবারটা রক্ষে করুন ধর্মবাপ, সিকি পয়সা আর বাকি থাকবে না।

নায়েব ডাকলেন, শোন্, শোন্—এদিকে আয় নটবর। তোদের ঐ মায়াকান্না শুনলে কি আর রাজ্যি রক্ষা করা যায়? আচ্ছা—আচ্ছা··· তামাক সাজ্ দিকি। তোর ধানের চারা খুব ভাল হয়েছে—না?

হ্যাঁ, বাবা—

কত জমিতে বীজধান ছড়িয়েছিস? কাঠা দশেক?

বেশি হবে, বাবা।

ভাল ভাল। তা হলে সে-ই কোন্ না বিশ-কুড়ি টাকার ফসল! মাণিক বরকন্দাজের দিকে চেয়ে নায়েব বললেন, এ সব খবর তো কই আমাদের কানে আসে না!

নটবর হাত জোড় করে অস্পষ্ট স্বরে আবার কি বলতে গেল। নায়েব বললেন, হ্যাঁ, হবে। ধানচারার একটা উপায় হবে বই কি! তুই হুজুরের হুকুম নিয়ে চলে যা এখন।

ছোটবাবু বললেন, আচ্ছা যা। কিন্তু জমি জমিদারের। আর কোনদিন লাঙ্গল চষবি নে—খবরদার!

ঘাড় নেড়ে নটবর বেরিয়ে এল। তারপর হেসেই খুন। জমি চষিস না—হঃ, বললেই হল! চষব না ত সোনা হেন ধানের চারা বুঝি

বীজতলায় শুকিয়ে মারব!···নায়েব মশায় লোক মন্দ নয়, ওর মনে মনে দরদ আছে। ছোটবাবু আগে চলে যাক সদরে। কাছারির কিছু পার্বণী লাগবে, তা লাগুকগে—

সৌদামিনী রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করল, কি হল?

কিছু, না, কিছু না, বাবু শিবতুল্য লোক—

সে জানি। তারপর আর্তকণ্ঠে সৌদামিনী বলল, জমি চষেছ বলে মারধোর করেছে কিনা, সেই কথাটা বল আমায়।

মারধোর? বাঃ রে—

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে নটবর বিব্রত হয়ে উঠল। বলল, মগের মুল্লুক নাকি! এ সব কথা কে বলেছে শুনি? বাবু যে আমাদের সাক্ষাৎ শিবঠাকুর।

সে ওরা সবাই—ঐ বরকন্দাজটা অবধি। শিবঠাকুরেরা ঢোল বাজিয়ে জমি নিলাম করেছে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দু-পুরুষে জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেই দিন থেকে তোমার মাথাধরা আর ছাড়ে না। তুমি বল না, কিন্তু আমি সমস্ত শুনেছি, সমস্ত জানতে পেরেছি।

সৌদামিনীর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। নটবর মৃদু কণ্ঠে অপরাধের স্বরে বলল, তার আর কি বলব বউ। ওদের দোষ কি, তিন তিনটে বছর মালখাজনা পায় নি—

সৌদামিনী আগুন হয়ে উঠল।

ওরা খাজনা পায় নি, আর তুমি এই তিন বচ্ছর দিন নেই, রাত নেই—তিল তিল করে জীবন দিয়েছ, তুমি কি পেয়েছ শুনি?

নটবর বলল, ঠাণ্ডা হ বউ, তুই একেবারেই আস্ত পাগল। খাজনা না পেলে ওদের চলে! বুড়ো-কর্তা কত টাকা দিয়ে বিষয় করে গেছেন—ছোটবাবু আজও বলছিলেন, সে টাকার সুদ পোষাচ্ছে না।

আর, আমার বুড়ো শ্বশুর ঐ আবাদ করতে সাপের কামড়ে মরেছেন, তাঁর ছেলেপুলের পেটে দানা পড়ছে না—সেটা কিছু নয় ?

অবোধ চাষার ঘরের বউ—নটবর যা বলেছে, পাগলই ঠিক ! এই কথাটা কিছুতে বোঝে না, লাঙ্গল টানতে টানতে গরু-মহিষও তো কত মুখ থুবড়ে মরে যায় ! মানুষ সাপের কামড়ে মরেছে, জ্বরে ওলাউঠায় পঙ্গপালের মতো মরেছে, বাঘ-কুমীরের পেটে গেছে—আবার নূতনের দল এসেছে, যুগের পর যুগ চলেছে, বন কেটে জনপদ হয়েছে, শস্যশালিনী পৃথিবী হাসছে। যাঁদের এই পৃথিবী, রাজ্য দেখতে তাঁরা মাঝে মাঝে শুভ পদার্পণ করেন, রাজ-কাছারিতে উৎসব পড়ে যায়, আলো জ্বলে, মাছ আর মিষ্টান্ন দেশদেশান্তর থেকে ভারে ভারে উদয় হয়, শতজনে তটস্থ, তিলমাত্র ত্রুটি যেন না ঘটে !···কবে কোন্‌খানে কে মরেছিল, কে তার ইতিহাস মনে রেখেছে—আর তার দরকারই বা কি !

প্রকাণ্ড দিন এবং তারও চেয়ে মন্থর চারিপ্রহর রাত্রি কেটে যায়, নটবরের কাজকর্ম নেই। বিলের মধ্যে কেবল তার ক্ষেতটাই ফাঁকা। যখন-তখন সে আলের উপর গিয়ে বসে, বুকের মধ্যে হু-হু করে। ওদের সব রোয়া হয়ে গেছে, এমন গোন আজ কত বছর হয় নি ! দেবরাজ অঝোর ধারে জল ঢালছেন, বৃষ্টির মধ্যে রিমঝিম রিমঝিম বাজনা বাজে, গাছপালা মাঠ-ঘাট উল্লাসে সবাই মিলে গান ধরে, বীজতলায় ধানের চারা দুষ্ট ছেলের মতো বৃষ্টিতে বাতাসে দাপাদাপি করে। হতভাগারা বলছে যেন, নিয়ে যাও গো আমাদের ঐ বড়-বিলের মাঝখানে। দুপুরের কড়কড়ে রোদ পড়বে মাথার উপর, চারিদিকে জল থৈ-থৈ করবে, দু-ক্রোশ পাঁচ-ক্রোশ থেকে বাদলা ছুটে আসবে, দেয়া ঝিলিক দেবে, কত আমোদ ! তার লাঙ্গল-বলদও যেন নিঃশব্দে কথা বলে, তার শূন্যক্ষেত হাতজোড় করে চেয়ে থাকে···

এমনি সময় এক-একদিন নটবর ভাবে, ঐ পাগলী—সৌদামিনীর কথাগুলো। জমি চষতে দেবে না···হুঃ, বললেই হল! আমার বাবা মরেছে সাপের কামড়ে—যে ক'টা ধান ছিল পেটে না খেয়ে বীজতলায় ছড়িয়েছি, জমি দেবে না তো এদের জায়গা দেব কি মাথার উপর? কেন দেবে না?

আবার একদিন সে কাছারি গিয়ে একেবারে কেঁদে পড়ল!

নায়েব মশায়, আর যে বাড়ি থাকতে পারি নে—

হল কি?

ফাঁকা ক্ষেত, দাওয়ায় বসলে দেখা যায়। থাকি কি করে? হুকুম দাও—রুয়ে ফেলি। ফসল না হয় কাছারির গোলায় উঠবে।

ছোটবাবু নেই, আমার হুকুমে হবে কি? আসছে, সদর থেকে পাকা হুকুম আসছে।

তারপর প্রায় রোজই নটবর হাঁটাহাঁটি করে।

চোখের উপর চারাগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে—তুমি যে বলেছিলে বাবা, উপায় একটা হয়ে যাবে।

নায়েব অভয় দিয়ে বলেন, হবে। বলেছি যখন—উপায় হবে না? ব্যস্ত হোস নে নটবর, পাকা হুকুম এল বলে।

অবশেষে হুকুম এল—পাকাই বটে। আদালতের ছাপ-মারা। নটবর সকালবেলা উঠে দেখে, বীজতলায় গরু পড়েছে।

হোই গো, কি সর্বনেশে কাণ্ড গো!

বাঁক নিয়ে তাড়া করতে গরু পালাল, এগিয়ে এল চরণ ঘোষ।

গরু তাড়াও কেন রে, মোড়ল? বারো টাকা গুণে দিয়ে বন্দোবস্ত পেয়েছি।

বন্দোবস্ত? নটবরের চক্ষু কপালে উঠল।

মাণিক বরকন্দাজ দখল দিতে এসেছিল, সে-ই সমস্ত বুঝিয়ে দিল।

জমি নিলাম হয়েছে, তাতে খাজনা সব শোধ হয় নি। তাই বীজতলার ধানচারা ক্রোক হয়েছে। চরণ ঘোষ জাতে গোয়ালা—গরু-বাছুর অনেক; গরুর খোরাকি কম পড়ে গেছে, তাই কাছারি থেকে বীজতলার বন্দোবস্ত নিয়ে গরু নামিয়ে দিয়েছে।

ভাল, ভাল। নটবরের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। বলতে লাগল, তোমাদের আক্কেল ভাল বটে মাণিক-ভাই। কোন চাষার সঙ্গে বন্দোবস্ত করা গেল না বুঝি! তবু আমার ধানচারা গরুর পেটে যেত না —ভূঁয়ে ঠাঁই পেত।

মাণিকের অনেক কাজ, হাসতে হাসতে সে চলে গেল। চরণ ঘোষের দিকে নটবর গর্জন করে উঠল, গরু নিয়ে চলে যাও, ভাল হবে না বলছি—

চরণ বলল, টাকা কি আক্কেল-সেলামি দিয়ে এলাম?

নটবর অধীর কণ্ঠে বলতে লাগল, ধান গরু দিয়ে খাওয়াবে, চাষার ছেলে হয়ে চোখে তা দেখতে পারব না--পারব না। গরু সরিয়ে নাও বলছি। না হয় আমিই উপড়ে দিচ্ছি, বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাওয়াও গে।

অদূরে দেখা গেল, চরণের ছেলে কানু—একটা দুটো নয়—তাদের গোয়ালসুদ্ধ গরু নিয়ে আসছে। তাই দেখে চরণের জোর বাড়ল। কিন্তু নটবর একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। বাঁক নিয়ে সে সমস্ত ক্ষেতে ছুটাছুটি করে। ধান মাড়িয়ে বীজতলা চষা-ক্ষেতের মতো কাদা-কাদা করে গরুগুলো ছোটে। নটবর চিৎকার করতে লাগল, বেরো—বেরো আমার জমি থেকে—

কানু ছুটে এল। বাপ-বেটায় এক সঙ্গে এসে নটবরের সামনে রুখে দাঁড়াল, খবরদার!

সঙ্গে সঙ্গে বাঁকের এক বাড়ি চরণের চোয়ালের উপর। চোখে অন্ধকার দেখল, বাবা গো—বলে জলকাদার মধ্যে সেইখানে চরণ বসে পড়ল। কানু চেঁচাতে লাগল। মাণিক বরকন্দাজ বেশি দূর যায় নি—ছুটতে

ছুটতে ফিরে এল, মাঠ থেকে চাষারা এল, গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষও কেউ আর বড় বাকি রইল না। সকলের শেষে এলেন নায়েব মশায়, অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, পিপীলিকার পাখা উঠেছে—

কিন্তু আসামীর দেখা নেই। ঘর-বাড়ি অন্ধি-সন্ধি কোথাও খুঁজতে বাকি নেই—গোলমালে কখন সে সরে পড়েছে, যেন পাখী হয়ে উড়ে গেছে।

উত্তেজনা ও আস্ফালন চলল রাত্রি অবধি। ক্রমশ যে যার বাড়ি যেতে লাগল, চারিদিক নির্জন হয়ে এল। সৌদামিনী আজ সমস্ত দিন রান্না করে নি, এক জায়গায় চুপটি করে বসে সকলের গালি শুনেছে আর কেঁদেছে। গভীর রাতে টেমি জ্বলছিল। টেমির আলোয় ছায়া দেখে সে চমকে উঠল। নটবর টিপিটিপি ঘরের মধ্যে এসে উঠেছে। ফিসফিস করে সে বলল, চরণ কেমন আছে রে বউ ?

ভাল। একটু চুপ করে থেকে সৌদামিনী বোধ করি উদ্যত অশ্রু রোধ করল। বলল, ভাল না থাকলে কি অমন বাঁধুনি-আঁটা গালি-গালাজ বেরোয় ?

নটবর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

সমস্ত চরণের ভিরকুটি। ছুতো ধরে পড়ে ছিল, আমি তখনই জানি—

সৌদামিনী বলল, তা বলে নায়েব ছাড়বে না। থানায় গেছে, কাল তোমার কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে। আর বলেছে, ঘরের চাল কেটে বসত ওঠাবে—

মুখখানা ম্লান করে নটবর বলতে লাগল, কেন ছাড়বে ? সুবিধে পেলে কে কাকে ছাড়ে বল্ ? একটা ফ্যাসাদ বাধলে দু-চার পয়সা পাওনা-থোওনাও তো রয়েছে ! তারপর সে বলল, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু ভাত-টাত আছে রে বউ ?

বধূ উঠে দাঁড়াল। ভাত তো নেই—রাঁধার সম্ভাবনাও নেই; উনুন ভেঙে হাঁড়িকুড়ি ভেঙে চাল-ডাল ছড়িয়ে তারা প্রতিশোধ নিয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে সৌদামিনী নটবরের হাত ধরে টানল।

চল, চলে যেতে হবে এখান থেকে—

নটবর একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসল। মেয়েমানুষ, তায় বয়সে কত ছোট —এইতো মাত্র ক-বছর আগে এই সংসারে এসেছে। কিন্তু সৌদামিনীর মুখের দিকে তাকালে নটবর প্রতিবাদের ভরসা পায় না। একটু ইতস্তত করে বলল, তাই চল্। জমি যখন দেবে না—চল্ তোর পিসের বাড়ি যাই তবে। পাইকঘেরির বন কেটে নাকি নতুন আবাদ করবে শুনছি।

যা কিছু সামনে পেল পুঁটুলি বেঁধে তারা কাঁধে নিল। ক'পা গিয়ে বধূ থমকে দাঁড়াল।

কি?

টেমিটা জ্বলছে যে!

নটবর তাচ্ছিল্যের ভাবে বলল, থাকগে, কি হয়েছে-জ্বলে জ্বলে আপনি নিভে যাবে।

কিন্তু সৌদামিনী মানা শুনল না। ঘরে ঢুকে জ্বলন্ত টেমি নিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে এল। এসে সেই টেমি ধরল চালের কিনারায়। নূতন ছাওয়া ঘরের চাল রাতের অন্ধকারে ঝিকমিক করছে। চালে আগুন ধরল। নটবর ছুটে এসে বলে, করলি কি! ঘরে আগুন দিলি, কি সর্বনাশ করলি বউ!

সৌদামিনী হেসে উঠল। আগুন দাউ-দাউ করে ওঠে—হাসি তার আরও উগ্র হয়। বলে, বয়ে গেল—বয়ে গেল। আমাদের কি—যাদের জিনিষ তাদের পুড়ছে—তাদের সর্বনাশ—

টেমিটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নটবরের হাত ধরে বাঁধের উপর দিয়ে ছুটল। নটবর আর ছুটতে পারে না।

থাম্, থাম্—ওরে বউ, ভুল-পথে চললি যে! পিসের বাড়ি কি এইদিকে?

না, যমের বাড়ি।

বালাই ষাট। নটবর একটু রসিকতার চেষ্টা করল। তোর যে কত সাধ, বউ। এই বয়সে—এত সকাল সকাল সেখানে যাবি?

সৌদামিনী বলল, হাঁ, যাব। গিয়ে সেই পোড়া বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করব, পৃথিবী যদি বাঁটোয়ারা করে দিয়েছিস—তবে আমাদের সেখানে পাঠাস কি জন্যে?

সাঁইবাবার গল্প

এরা সব খড়ের টুকরো, হাওয়ায় এলোমেলো ওড়ে···তারপর একসময় মাটিতে পড়ে যায়, জলে কাদায় পচে মাটির সঙ্গে মেশে, পৃথিবী উর্বরা শস্যশালিনী হয়, তোমাদের সুখ-সমৃদ্ধি উছলে ওঠে।

এমনি দু'টি খড়ের টুকরো একবার কলকাতা শহরে এল। দূরতম পাড়াগাঁয়ে কোথায় কি ভাবে ভাইটি কলেজে পড়াশুনা করত,—আর বোন বাড়ি বসে সংসার দেখত, ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করত, ভাব করত, জোর করে বিদ্যার ভাগ একটু-আধটু আদায় করত, সে কথায় দরকার নেই। এই আজ সকালেও আমার স্ত্রী ঐ সব গল্প করছিল—তারও অবশ্য শোনা গল্প। মোটের উপর দু'টি ভাই-বোন শেষ পর্যন্ত

শহরে এসে পৌঁছল। শিয়ালদহে নেমে কমলা বলল, উঃ, কত গাড়ি আর কেমন সব বাড়ি! গাঁয়ের মুখে লাথি মেরে চলে এলাম দাদা, আর যাচ্ছি নে—

প্রফুল্লর বুদ্ধি আছে, অনেক দেখেছে, অনেক শিখেছে। সে বলল, এ তো আমাদের নয় বোন,—কিচ্ছু আমাদের নয়। চল্ না—দেখ্বি কোথায় গিয়ে উঠি—

উঠল একটা গলির মধ্যে নিচের তলার ঘরে।

কমলা তাতে দমে না, স্ফূর্তি আরও বেড়ে যায়। বলে, মাগো, কি করে যে থাকতাম সেখানে! প্যাচপেঁচে কাদা আর বিশ্রী জঙ্গল। শোন দাদা, আমি সেলাই শেখাব, বাজনা শেখাব, আর পার তো ছোট-খাট একটা মাস্টারি জুটিয়ে দিও—

প্রফুল্ল ঘাড় নেড়ে বলে, অত সহজ নয় রে বোন। আমাদের মতো আরও হাজার ভিখারি বড়লোকের আঁস্তাকুড়ে হাত বাড়িয়ে আছে—

কমলা কানই দেয় না। সে বলে চলেছে, আমি টাকা আনব—আর তুমি কাগজে কাগজে কবিতা লিখবে, কত নাম বেরুবে, চারিদিকে জয়-জয়কার পড়ে যাবে।···হাসছ যে, ও মণি-দাদা! কেন মেয়েমানুষের টাকা রোজগার করতে নেই না কি?

বোনের কল্পনা-প্রবণতায় প্রফুল্লর মজা লাগে। অবশেষে নিজেও যোগ দেয়, তার উৎসাহ ভেঙে দিতে মন সরে না। হাসতে হাসতে সে বলে, ব্যবস্থা ভাল। পাছে গান শিখতে বলি, আগে থেকে তাই মতলব আঁটছিস। চাকরি করব আমি। তোকে মস্ত বড় কালোয়াত করব। অমন গলা যদি আমার থাকত, কি করতাম জানিস?

কমলা বলে, কি করতে বল না।

চোখ-মুখ ঘুরিয়ে প্রফুল্ল বলে, সে কত কি ব্যাপার!

একটাই বল না।

দিন-রাত গান করতাম। গান শুনে গোলাপ ফুটত, টুনটুনি পাখী জানালার ধারে ভিড় করত—

কমলাও তেমনি স্বরে বলতে লাগল, গরুগুলো হাম্বারবে দেশ ছেড়ে পালাত, বস্তির মোটা মিস্ত্রিটা ঠ্যাঙা নিয়ে ছুটে আসত। বলতে বলতে সে আর এক কথা পাড়ল, ও দাদামণি, টুনটুনির মতো একটা বৌদিদি এনে দিতে হবে কিন্তু। দু-জনে মিলে-মিশে ঘর-সংসার করব—একা একা আর পারি নে।

প্রফুল্ল বলে, রোস্, তার আগে ঐ মোটা মিস্ত্রির মতো একটা ঠ্যাঙাড়ের জোগাড় দেখি—তোকে যে জব্দ রাখতে পারবে।

ছোট ঘরখানি ভরে হাসির তুবড়ি ফোটে।

কমলা মনে মনে বলে, তা বই কি! তুমি আমার তেমনি ভাই কি না—ঠ্যাঙাড়ের হাতে দেবেই বটে! তোমার মনের ইচ্ছে বুঝি গো বুঝি—

কলিকাতা শহর—কাঠার মাপে জমির হিসাব হয়, ঘরের গহ্বরে একসঙ্গে দু-হাজার মানুষ সিনেমার মজা দেখে, আলোর ভিড়ে চাঁদ দেখা যায় না। তোমাদের এই শহরের অনেক—অনেক দূরে সুন্দরবন। নোনা জলের বড় বড় গাঙ—বনকেওড়া, ঝাউ ও গর্জন গাছের গোড়া অবধি জোয়ারের জল ছলছল করে। গাছে গাছে বানর, নিচে হরিণের পাল। দিন-দুপুরে হঠাৎ বাঘ ডেকে ওঠে, ঝামটি বন থেকে বেরিয়ে কখন বা গম্ভীরভাবে ফাঁকায় বেড়িয়ে বেড়ায়, দোয়ানির ধারে নিঃশঙ্কে নিদ্রা যায়।

এরই মধ্যে এক-একটা বড় গাছের তলায় আইটের উপর সাঁইবাবাদের আসন। এমনি এক সাঁইবাবার গল্পই বলব···সবুর, ভাই সবুর—

আকাশের তারা বন্ধন
পাতালের বালি বন্ধন
বাঘ বন্ধন—ভালুক বন্ধন—
সাপ বন্ধন—শুয়োর বন্ধন—
দোহাই মা বনবিবি,
দোহাই দক্ষিণরায়—

বাঘ, সাপ, পোড়ো, দানো—বন্ধন ভেদ করে সামনের কাছে কারও যাবার হুকুম নেই। সাঁইয়ের মন্ত্রে বাঘের মুখ বন্ধ হয়ে যায়; সাঁতার কেটে সাঁই গাঙ-খাল এপার-ওপার করেন, সাধ্য কি যে কুমীর-কামট বিশ হাতের মধ্যে আসে! কাঠ কাটতে, মোমমধু ভাঙতে কিম্বা শিকার করতে যারা বাদায় ঢোকে—সকলের আগে সাঁইবাবার খোঁজ করে, গাছতলায় পূজা দেয়, মুরগী মানত করে—তারপর নির্ভয়ে দুর্গম জঙ্গলের দিকে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দেয়। তখন আর কেউ কিছু করতে পারবে না।

তবে মুশকিল এই যে, বাবাদের আসনের ঠিক নেই। এ-বছর এই এখানে, আবার ও-বছর আর যে কোথায় গেলেন—কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। গভীর রাতে সুন্দরবন থম-থম করে; হরগজা-ঝাড়ের নিচে দিয়ে ভাটার জল নেমে যায়; বনভূমির অন্ধকার রহস্য-নিবিড় হয়ে ওঠে। মাঝিরা ওদিকে চাপান সেরে রান্না-বান্নার উদ্যোগ করে, বুকের ভিতর কিন্তু গুর-গুর করতে থাকে। হঠাৎ হয়তো ঘন জঙ্গলের মধ্য থেকে শোনা গেল—কু-কু-কু। ভয় নেই, আর ভয় নেই—কাছেই কোন সাঁইবাবা আছেন!···শুনবে ভাই, এই সাঁইবাবার গল্প? সবুর!

আমার সঙ্গে প্রফুল্লর পরিচয় হরিকেশব দত্তর বাড়িতে। হরিকেশব আমাদেরই পাড়ার লোক···আগে কাঠের গোলা ছিল, তাতে কিছু পয়সা হয়েছে, তারপর এই ক-বছর সুন্দরবন অঞ্চলে অনেকটা জমি ইজারা নিয়ে ধানের আবাদ করছেন। ও ত ভদ্রলোক একেবারে লাল হয়ে গেছেন। তেতলা বাড়ি উঠেছে, বড় মোটর কিনেছেন, আবার নামের সঙ্গে কেউ যদি 'জমিদার' লিখতে ভুলে যায়, মনে মনে তিনি চটে যান। সম্প্রতি হরিকেশব আধুনিক হবার চেষ্টায় আছেন। মেয়েকে লেখাপড়া শেখান হচ্ছে—কলেজে দিতে সাহস হয় না, তাঁর ধারণা কলেজি মেয়ে কেউ বিয়ে করতে চায় না—বাড়িতে পড়াবার বন্দোবস্ত হয়েছে, প্রফুল্ল এসে দুই বেলা পড়িয়ে যায়। ঐ আবাদ অঞ্চলে প্রফুল্লর বাপের সঙ্গে হরিকেশবের খুব জানাশোনা হয়েছিল, সেই সুবাদে প্রফুল্লর সঙ্গে পরিচয়। শোভনা প্রফুল্লকে দাদা বলে ডাকে। ইদানীং কমলাও এদের বাড়ি আসা-যাওয়া করছে, শোভনার সঙ্গে তার খুব ভাব; যখন-তখন শোভনা নিমন্ত্রণ করে, না এলে রাগ করে—অভিমান করে; ভয় দেখায়, বাসায় গিয়ে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে। ঐ ভয়ে কমলা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, এঁদো-বাসায় এদের সে নিতে চায় না। অগত্যা তাকেই যখন-তখন আসতে হয়।

গঙ্গায় বান ডেকেছে, গড়ের মাঠে জল উঠেছে। দত্তমশায় মেয়ে নিয়ে বান দেখতে যাচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা, আমাকেও গাড়িতে তুলে নিলেন। ঘোরাঘুরি করতে খানিকটা রাত হয়ে গেল। ফিরে এসে দেখা গেল, পলাতক ছাত্রীর অপেক্ষায় প্রফুল্ল তখনও বসে রয়েছে; জানালা দিয়ে আকাশের মেঘপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে আছে। শোভনা খিলখিল করে হেসে উঠল, কি দেখছেন দাদা? স্বভাবের শোভা?

হুঁ, ওতে পয়সা লাগে না।

শোভনা রাগ করে বলল, যখন-তখন আপনি পয়সার কথা তোলেন। মনের ভিতর কবিতা দাপাদাপি করছে—সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা হয় বুঝি!

প্রফুল্ল হাসিমুখে বলল, তা-ও হতে পারে। কারণ ওর সঙ্গে পয়সার সম্পর্ক নেই। কবিতা লিখতে পয়সা লাগে না, লিখলেও কেউ পয়সা দেয় না।

এই সব হচ্ছে, এমনি সময় আমি ও দত্তমশায় এসে পড়লাম। ধান-চাষ সম্পর্কে দত্তমশায়ের মতামত অভ্রান্ত। এবং তিনি বিবেচনা করেন, সাহিত্য সম্পর্কেও ঠিক তাই। দত্তমশায় প্রতিবাদ করে উঠলেন, কেন? কেন? কবিতা ভাল জিনিষ—আমার তো খুব ভাল লাগে। খাওয়ার পর আমি তামাক খাই নে, শুয়ে শুয়ে কবিতা শুনি। খুকী পড়ে শোনায়।

প্রফুল্ল ও আমি দু-জনেই হেসে উঠি। প্রফুল্ল বলে, বেশ করেন স্যর। তামাকের পয়সা বেঁচে যায়; ঘুমও আসে। বিনা পয়সায় ঘুমোবার এমন ওষুদ আর নেই।

বিনা পয়সা কি বল হে? কবিতায় বুঝি পয়সা হয় না? রবি ঠাকুরের গীতগোবিন্দ যে নোবেল সাহেব আড়াই লক্ষ টাকায় কিনে নিলেন। তাই দিয়ে পাবনার জমিদারি কেনা হল। বুদ্ধির ভুল—জমিদারি করতে হয় ওখানে! পদ্মার ভাঙন লেগে আছে, আজ যেখানে মাটি, কাল সেখানে অথই জল। সুন্দরবনের দিকে যাওয়া উচিত ছিল।

এই রকম উচ্চাঙ্গের আলোচনা চলত হরিকেশবের সঙ্গে। এমনি লোক মন্দ নন; এক দোষ, বড় টাকার দেমাক করেন—তিনি অনেক রোজগার করেছেন এবং এখনও করছেন, এই কথাটা সকলকে পাকে-প্রকারে জানিয়ে দেওয়া চাই। একদিন বললেন, পয়সা? পয়সা রোজগার

করা কঠিন কি হে—উড়ে বেড়াচ্ছে পয়সা, ধরে নাও। আমি যখন প্রথম কলকাতায় আসি—

প্রফুল্ল বাধা দিয়ে বলে, সে অনেক কালের কথা স্যর, তখন হয়তো উড়ে বেড়াত। এখন আপনারা ধরে নিয়ে সব ব্যাঙ্কে আটকে ফেলেছেন। সেখানে ছা-বাচ্চা হচ্ছে।

টাকার বাচ্চা? হা-হা হা—। হরিকেশব খুব হাসতে লাগলেন।

আমি বললাম, বুঝলেন না? টাকার স্থদ হয়, সেই কথা বলছেন—

প্রফুল্ল বলতে লাগল, সত্যি কথা স্যর, অতি চমৎকার জিনিষ ঐ টাকা। ব্যাঙ্কে ফেলে রাখুন, রেখে নিশ্চিন্তে ঘুম দিন—ও জিনিষ আপনা থেকেই বেড়ে চলবে; আমাদের রক্ত খেয়ে বাচ্চায় বাচ্চায় অফুরন্ত হবে। দু-হাতে উড়িয়ে বেড়ান, শেষ হবে না।

এসব কথা বলতে বলতে—আমি দেখেছি, প্রফুল্ল যেন আর এক মানুষ হয়ে যায়। শোভনার দেখে ভয় করে, কষ্টও হয় বড়। সে একটি কথাও বলে না, কিন্তু মনে মনে অনুভব করে, কোথায় কি সব মর্মান্তিক অত্যাচার হচ্ছে,—মনের মধ্যে যার পৃথিবীদাহী আগুন, তাকে যেন জবরদস্তি করে গ্রামারের ভুল কাটতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রফুল্ল হেসে ওঠে।

জানেন স্যর, জীবনে আমি ঘি খাই নি। জগতে ঘি নামে একটা ভোজ্য বস্তু আছে, আমার কাছে তা মিথ্যা।

হরিকেশব বললেন, ঘি খাও নি, বল কি! পাড়াগাঁয়ের ছেলে—আর যাই হোক, সেখানে তো ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ—

ওসব কেতাবে আছে, স্বপ্নের কথা—দেশের মধ্যে নেই।

কথাবার্তার মাঝে অকস্মাৎ ছেদ টেনে প্রফুল্ল পড়বার ঘরে চলে যায়, গম্ভীরভাবে একখানা বই টেনে নিয়ে বসে। আমার দিকে চেয়ে হরিকেশব বলেন, ছোকরা পাগল!

অনেক রাত হয়ে গেছে। যাবার জন্য প্রফুল্ল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছে। *শোভনা বলল, একটা কথা বলি দাদা, আমার জন্মদিন আসছে বুধবারে।* আপনাদের আসতে হবে।

ঘি খাওয়াতে চাও? প্রফুল্ল হেসে প্রশ্ন করল।

শোভনা রেগে আগুন। তাই কি খাবেন আপনি? পাতে দিলে ফেলে দেবেন। গরিবানা আপনাদের বিলাস। দেখুন—আপনার যা অহঙ্কার, লক্ষপতি কোটি-পতিরও তেমন নয়।

রাগ দেখে প্রফুল্লর হাসি বেড়ে যায়। বলে, অহঙ্কার করি নে, কিন্তু দারিদ্র্যকে অপরাধ বলেও মনে ভাবি নে। দেখ শোভনা, আমার বাবা এক আবাদের কাছারিতে পাইকগিরি করতেন—

শোভনা বিস্মিত হয়ে বলে, পাইকগিরি কি বলেন! শুনেছি তিনি কোথাকার বড় নায়েব ছিলেন।

প্রফুল্ল বলল, তোমার বাবার মুখে শুনেছ। লোকের কাছে বাবা ঐ বলতেন বটে, নইলে মান থাকে না। সে যাই হোক, আমি বার দুই-তিন গিয়েছি আবাদে। লকগেট আছে, খুলে দিলে আবাদের সমস্ত জল বেরিয়ে যায়। তোমার জমিতে তুমি যত খুশি আলি বাঁধ, জল আটকাতে পারবে না। আলি ভাঙতে না পারে, চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল বেরিয়ে যাবে। ঐ যে জল থাকে না, এতে চাষার কি দোষ?···আমাদের গরিব হতেই হবে, না খেয়ে মরতে হবে, এতে আমার কোন দোষ নেই, এর জন্য মাথা নিচু করে থাকবারও কারণ নেই। বরঞ্চ মাথা উঁচু করে পার তো ঐ লকগেটটা বন্ধ করগে, জল যাতে শুষে বেরিয়ে না যায়।

শোভনা খানিক গম্ভীর হয়ে থাকে। শেষে বলে, অত কথা আমি বুঝি নে, মাস্টারমশায়। তবে এইটে জেনে রাখুন, আপনারা না এলে আমি বই ছিঁড়ে দোয়াত ভেঙে তচনচ করব।

তারপর আবদারের স্বরে বলতে লাগল, বেশি লোক হবে না, ভয় নেই। গুটি পাঁচ-ছয় বন্ধুকে মাত্র ডেকেছি। আমার জন্মদিনে আপনারা আসবেন না, সে কি হয়?

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়ল।

খুশি হয়ে শোভনা বলল, আর কমলা-দি—তাকেও নিয়ে আসবেন। বুঝলেন তো? নইলে গান করবে কে?

প্রফুল্ল বলল, আনতে হবে কেন? সে বুঝি পথ চেনে না—

অভিমানে মুখ ভারি করে শোভনা বলল, ওঃ, আপনি কিছু বলবেন না—এই তো?

হাসতে হাসতে প্রফুল্ল বলল, বেশ, বলব। বরঞ্চ আমি ভাবছি, কমলাই এসে গান-টান করুক, আমোদ-স্ফূর্তির মধ্যে আমায় মোটে মানায় না। তা ছাড়া একটু কাজও আছে সেদিন—কলকাতায় থাকা মুশকিল হবে—

শোভনা চুপ হয়ে রইল।

প্রফুল্ল বলল, কি বল?

শোভনা বলল, আমি ভাবছি, আমারও ঐদিন কাজ আছে—কলকাতার বাইরে যেতে হবে।

কোথায়?

হাসি চেপে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে শোভনা বলল, বাবার সঙ্গে সুন্দরবনের চকে।

কেন? লকগেট দেখতে?

উঁহু, বানর-হনুমান দেখতে। বলতে বলতে সে খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসিতে গুমট পরিষ্কার হয়ে গেল।

প্রফুল্ল বলল, সেটা কি এখানে থাকলে হবে না ?

কই আর হবে! মানুষ বেছে বেছেই যে বলা হচ্ছে—বানর-হনুমানদের নেমন্তন্ন বাদ—সত্যি বাদ—দয়া করে আসেন তো দেখতে পাবেন।

তবু প্রফুল্ল এল না। শোভনা খুব দুঃখ পাবে, সে জানে—কিন্তু বড়লোকের পার্টি সে বরদাস্ত করতে পারে না। বিনিয়ে-বিনিয়ে-বলা কথা, ওজন-করা হাসি, ঘাড় বেঁকিয়ে মিহিস্বরের অনুরোধ···এরা যেন তাসের দেশের মানুষ—যে পৃথিবী নিরন্নের অশ্রুতে জীবন্ত, এরা যেন সেখানকার কেউ নয়।

কমলা এসেছে। শোভনা দুঃখিত ভাবে বলল, আপনার দাদা ?

পরে আসবে, নিশ্চয় আসবে।

শোভনা হঠাৎ বলল, আচ্ছা কমলা-দি, আপনারা দু'টি তো দুই রকমের মানুষ। অথচ ভাই-বোনে এমন ভাব বুঝি জগতে নেই—

কমলা বলল, কোন্ শত্রু রটনা করেছে শুনি ?

শত্রু নয়, মিত্রেরাই বলে থাকেন। আপনি বলেন তাঁর কথা, তিনি বলেন আপনার কথা।

আমরা বলেছি যে আমাদের মধ্যে ভয়ানক ভাব ?

না। বরঞ্চ বলেন, রাতদিন খিটিমিটি। কিন্তু আপনাদের চোখ-মুখ বলে···কণ্ঠস্বর বলে দেয়—

বলে নাকি ? ভ্রাতৃগর্বে কমলার বুক ভরে উঠল। তার দাদা জীবনে কত আঘাত পেয়েছে, কত নির্যাতন সয়েছে, কোনদিন কেউ সহানুভূতি দেখায় নি—প্রথম জীবনের আমুদে কবি-স্বভাব দাদা আজ বিশ্বের আনন্দরূপ দেখতে একেবারে ভুলে গেছে।

শোভনা বলতে লাগল, আচ্ছা কমলা-দি, আপনারা দু'জনে এক সঙ্গে কোথাও যান না কেন ?

আকাশে চাঁদ-সূর্য এক সঙ্গে থাকে না কেন, বল তো বোন ? আমি আসতে দিই না—তা হলে তার আলোয় আমি যে একেবারে ঢাকা পড়ে যাব।

হিমাদ্রি মিটার কেমিস্ট, জার্মেনি-ফেরত—এই বাড়িতে সম্প্রতি একটু অধিক আনাগোনা করছে। তার প্রতি হরিকেশবের বিশেষ পক্ষপাত আছে। কমলার গান শুনে মিটার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল, জিনিয়াস !

তারপর একটু ফাঁকায় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কলেজে পড়েন বুঝি মিস রায় ?

বেথুনে। এমন মিথ্যাকথা কমলা জীবনে এই প্রথম বলল।

হস্টেলে থাকেন ?

না, বাড়িতে।

বাড়ির কথা কমলা ইচ্ছা করেই বেশি বলল না। বলল, আমি এখানে প্রায়ই আসি। শোভনা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

হিমাদ্রি বলল, আমাকেও খুব আসতে হয়। নানা রকম বিজনেস—

কমলা হাসল। বলল, একটা অবশ্য জানি, সেটি আমার বন্ধুর সঙ্গে।

হিমাদ্রি প্রতিবাদ করে বলল, অনুমান ভুল হয়েছে মিস রায়। বেশি হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবার সঙ্গে। সুন্দরবনের কাঠে ম্যাচ-ফ্যাক্টরি চলতে পারে কিনা, তারই এক্সপেরিমেণ্ট হচ্ছে।

শোভনা এল, এসে বাহু-বেষ্টনে কমলাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, কমলা-দি ভাই, ওপরে চল। তোমার আর একটা গান শুনবার জন্য মা ওঁরা পাগল হয়ে আছেন। হিমাদ্রির দিকে চেয়ে চপল কণ্ঠে বলল, পালাবেন না কিন্তু মিস্টার মিটার, আমরা এক্ষুণি আসছি।

একদিন কমলা বলল, দাদা, আজ সিনেমায় যাচ্ছি। আমি, শোভনা আর হিমাদ্রিবাবু—

এক মুহূর্ত শান্তদৃষ্টিতে চেয়ে প্রফুল্ল বলল, বোন, দেশে ফিরে যাই চল্—এ জায়গা আমাদের নয়।

তা বই কি! আমাদের জায়গা কিনা দেখো এখন। তারপর হেসে উচ্ছ্বসিতভাবে কমলা বলতে থাকে, পাড়াগাঁয়ে গিয়ে কি চতুর্ভুজ হবে? কি করবে সেখানে?

সবাই যা করে—দলাদলি পরচর্চা করব, তাস-দাবা খেলব,—যাদের অন্ন নেই, অন্ন-যোগাড়ের উপায়ও নেই—তেমনি দশজনে যা করে থাকে। সেখানকার দুঃখ এত নিদারুণ নয়।

প্রফুল্ল বেরিয়ে গেল। একটু পরে একগাদা প্রসাধনের জিনিষ-পত্র নিয়ে উপস্থিত। কমলা আশ্চর্য হয়ে বলল, এ-সব আনতে কে বলেছে?

বল নি। কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছিল বোন, অবস্থা বিবেচনা করে বলতে পার নি।

কমলা বলল, হ্যাঁ, তুমি দৈবজ্ঞ ঠাকুর হয়েছ, মনের কথা গুণে বের করতে পার—

প্রফুল্ল হেসে বলল, একটু একটু পারি বই কি। এই যেমন, আমার বোনটির মন সোনার হরিণের পিছনে ছুটেছে।···কিন্তু সাবধান, সাবধান! সোনার পোষাকটা সরিয়ে দিলে দেখা যাবে, হরিণ নয়—ওরা রাক্ষস।

এই প্রসঙ্গ কমলা এড়িয়ে যেতে চায়। জিজ্ঞাসা করল, এত কিনবার টাকা কোথায় পেলে? তোমার জুতো ছিঁড়ে গেছে, নতুন জুতোর কথা বলছিলে,—সেই টাকায় বুঝি?

প্রফুল্ল বলল, জুতো কি হবে? গ্রামে যাচ্ছি, সেখানে জুতো লাগে না।

কমলা রাগ করে বলল, তোমার এ-সব আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব।

কিন্তু ফেলল না, হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিনিষগুলো দেখতে লাগল। যখন প্রশংসার লোক জোটে, তখন বেশি করে প্রশংসা কুড়োতে লোভ হয় না কার? মনে মনে ভাবে, আসুক সেদিন—দাদাকে এই রকম পথে পথে পৃথিবীর কুৎসা গেয়ে বেড়াতে দেব নাকি? সে আমি দেখে নেব।

দিন কয়েক পরে এক অঘটন ঘটল। প্রফুল্ল যথারীতি পড়াতে ঢুকছে, হরিকেশব পথ আগলে দাঁড়ালেন। রুক্ষকণ্ঠে বললেন, এই চৌকাঠ কোনদিন তোমরা পার হয়ো না···তুমি না, তোমার বিশ্বেশ্বরী বোনটিও না। আজকে যাও—কিন্তু এর পর দেখতে পেলে অপমান করব।

প্রফুল্ল থমকে দাঁড়াল, অবস্থাটা সে কিছু আঁচ করেছে। দাঁতে ঠোঁট চেপে মুহূর্তকাল সে সামলে নিল। তারপর হেসে বলল, তবু ভাল, অপমানটা আজকে মুলতুবি রাখলেন। সেজন্য কৃতজ্ঞ রইলাম।

শ্লেষ এত স্পষ্ট যে হরিকেশবেরও বুঝতে আটকায় না। বললেন, তোমাদের কুকুর-শিয়ালের কি গালিতে অপমান হয়,—পিঠে পড়লে তবে।···এখানে নয়, চৌকাঠের ঐ ওপারে দাঁড়িয়ে যা হয় বল।

হরিকেশব কতকগুলো টাকা ছুঁড়ে রাস্তায় ফেললেন। নির্বিকারভাবে প্রফুল্ল কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

এর পর একদিন কোথা থেকে এসে প্রফুল্ল জামা খুলছে, বিবর্ণ মুখে কমলা বলল, দাদা, এই চিঠি—

কিসের চিঠি রে?

নেমন্তন্নর।

বোনের দিকে চেয়ে আর কিছু না বলে প্রফুল্ল চিঠি পড়ল। শোভনার সঙ্গে হিমাদ্রির বিয়ে হচ্ছে সপ্তাহ খানেক পরে।

কোথায় পেলি এ চিঠি ?

থতমত খেয়ে কমলা বলল, শোভনা দিয়েছে।

মিথ্যে কথা বলছিস। তারা দেবে না—কক্ষণো দেবে না। চিঠিতে আর একবার চোখ বুলিয়ে প্রফুল্ল বলল, আর, এ তো দেখছি হিমাদ্রি বাবুর তরফের চিঠি। তিনি দিয়েছেন ?

তার কি সে সাহস আছে ?

রাগ করতে গিয়ে কমলা কেঁদে ফেলল। বলল, এখন পালিয়ে বেড়ায় দাদা, দেখাশুনা হয় না। আজ আমি নিজে চলে গিয়েছিলাম, এই চিঠি তার টেবিল থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছি।

ছোট মেয়েটির মতো কমলা বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। তার মাথায় হাত রেখে গম্ভীর মুখে প্রফুল্ল বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে বলল, দেশে ফিরে যাই চল্, বোন—

যাব। বলে কমলা উঠে বসল।

এই রাত্রে—এখনই। যা-কিছু আছে, বেঁধে-ছেঁদে নে।

কমলা মাথা নেড়ে বলল, না দাদা, ক'দিন পরে। আমার ক'টা কথা আছে।

প্রফুল্ল বলল, বাজে কথায় কি হবে ? যা কঠোর সত্য, কথায় কি তার নড়চড় হয় ? ওরা যে জাত আলাদা।

কমলা বিস্মিত চোখে চাইল। বলতে লাগল, না, না—ভুল শুনেছ দাদা, ওরাও কায়েত।

সে জাতের কথা নয়, বোন। ওরা বড়লোক, আমরা গরিব। তেলে জলে মিশ খায়, কিন্তু এ দুই জাতে মিশবার জো নেই।

বলতে বলতে প্রফুল্লর চোখ জ্বলে ওঠে, কণ্ঠস্বরে আগুন ছুটতে থাকে। বলল, ছোটবেলা থেকে দেখছি। এই কলকাতা শহরে এতদিন আছি, দুয়ারে দুয়ারে তাড়া খেয়ে আসছি···নেড়ি-কুকুরকে ওরা যে চোখে দেখে, গরিবদেরও তাই।

কিন্তু কুকুরও কামড় দিতে পারে, একথাটা ওরা ভুলে রয়েছে।

রোজ বিকালবেলা বাড়ি থেকে ক'টা গলি পার হয়ে এসে রাস্তার মোড়ে কমলা ঘুরে বেড়ায়। লোকে লক্ষ্য করে, কত কি বলাবলি করে, কমলা ভ্রূক্ষেপ করে না—অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করে। এই পথে হিমাদ্রির মোটর যায়। ক'দিন দেখতেও পেয়েছে গাড়িখানা। কমলা হাত উঁচু করে বলে, শোন গো, শোন—গাড়ির স্পীড সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক রকম বেড়ে যায়, পেট্রোলের গর্জন ওঠে, সে শব্দে কোন কথা কারও কানে ঢোকে না। কমলা বাড়ি ফিরে আসে, ফিরবার পথে কোন কোন দিন একটুখানি ঘুরে হিমাদ্রির বাড়ির সামনে দিয়ে আসে, সেখানে আগের মতো অবাধে ঢুকতে পারে না। নেপালি দারোয়ান দরজায় বসে আছে। কমলার মনে হয়, দারোয়ানটাও বুঝি তার দিকে মুখ টিপে হাসছে।

প্রফুল্ল বলল, কাল কিন্তু মাসের শেষ তারিখ। পরশু সকালে বাড়িওয়ালা জিনিষপত্তোর টেনে রাস্তায় ফেলে দেবে—নতুন ভাড়াটে ঠিক হয়ে গেছে।

কালই যাব দাদা।

পরদিন সমস্ত দুপুর কমলা জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা করল। তারপর সবচেয়ে ভাল যে শাড়িখানা তাই পরল, বেশ-বিন্যাসের যত কিছু ছিল সমস্ত নিয়ে আয়নার সামনে অনেকক্ষণ বসে বসে অনেক যত্নে সাজ-গোজ

করল। এমনই সুন্দর,—যাবার দিনে সে রাজরাজ্যেশ্বরী সাজল। তারপর আসন্ন সন্ধ্যায় চলল সেই মোড়ের দিকে। সামনে দেখে, সেই মোটর—ঝক-ঝকে নেভি-ব্লু রঙ, ড্রাগনমুখো হর্ন—

দাঁড়াও গো দাঁড়াও, শোন একটা কথা—

হিমাদ্রি চকিতে চোখ তুলল। চোখে আর পলক পড়ল না—কি সুন্দর মুখখানি—বিষাদ-মলিন, চমৎকার! স্টিয়ারিং-চাকার উপর তার হাত কেঁপে গেল। কমলা ততক্ষণে গাড়ির ফুটবোর্ডে লাফিয়ে উঠেছে। বলতে লাগল, শোন, আমার কথার জবাব দিতে হবে। কেন তুমি এমন করলে? কি করেছি আমরা?

জবাব দেবে কি, মুগ্ধ চোখে হিমাদ্রি চেয়ে আছে। সম্বিৎ পেয়ে শেষে বলল, ভিতরে এস, এই এইখানটিতে পাশে বস দিকি···শুনছি—

একটি কথায় কি হয়ে যায়, চাঁপাফুল থেকে কালসাপ গর্জন করে বেরিয়ে আসে। বলল, পাশে বসব? বুকের উপর দাঁড়িয়ে নাচব। অনেক সর্বনাশ করেছ। আইন-আদালতে তোমাদের শাস্তি হবে না। এবার নিজের হাতে শাস্তি দেব।

উন্মাদিনীর মতো সে হিমাদ্রির টুঁটি চেপে ধরল। কেমিস্ট সাহেব মুহূর্তকাল হতবুদ্ধি হয়ে রইল, তারপর একসেলেটর চেপে ধরল। গাড়ি ছুটল। বাতাসের বেগে ছুটেছে—বোঁ-ও-ও-ও। স্পীডোমিটারে উঠছে ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন—। ধাক্কা মেরে হিমাদ্রি কমলাকে ফেলে দিল ফুটবোর্ডের উপর থেকে। মনোরম সাজ-গোজ নিয়ে সোনার স্বপ্নরাশি নিয়ে সুন্দরী মেয়ে পড়ল পথের কাদায়। বুকের উপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে গেল। একটা অস্পষ্ট গোঙানি, তারপর সব শেষ—ভলকে ভলকে মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। ঘড়াং করে গাড়িটা থামল।

এক মুহূর্ত। তারপর, চালাও—চালাও। হিমাদ্রি এদিক-ওদিক তাকায়, তীরগতিতে গাড়ি চলতে থাকে।

অসংখ্য লোকের ভিড়, গাড়ির ভিড়। প্রফুল্ল এসেছে, তার চোখে জল নেই। অতিশয় শ্রান্ত ভাবে বোনের গায়ের কাপড়-চোপড়গুলা ঠিক করে দিচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে একজন বলে, মোড়ে মোড়ে এই রকম। রাস্তায় বেরুলে শ্মশানের খরচ পকেটে করে নিতে হয়। আর একজন বলে, মোটর নয়, দুশমন; রাগ যেন আমাদের উপরই বেশি। চড়বার টাকা নেই কিনা, তাই চাপা দেয়।

পথ-ঘাটের দুর্ঘটনার গল্প করতে করতে কৌতূহলীর দল এক আসে, এক চলে যায়।

পুলিশ বলে, মড়া পাবেন না তো। এখন পোস্ট-মর্টেমে যাবে। আপনি থানায় চলুন।

কেন ?

গাড়ি সনাক্ত করতে হবে। আপনাদেরই দরকার।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রফুল্ল বলে, আমাদের নয়—আমরা তো পোকামাকড়। তবে তোমাদের আছে হয়তো। আচ্ছা, চল যাচ্ছি—

তারপর মামলা-মোকর্দমা চলল মাস চারেক ধরে। আদালতে টানা-হেঁচড়া—শেষ পর্যন্ত হিমাদ্রি খালাস পেয়ে গেল বটে, কিন্তু গোলমালে অনেক পাঁক বেরিয়ে এল, অনেক পয়সা অনেকের পকেটে গেল। এই সব ব্যাপারে বিয়ে ভেঙে গেল, শোভনার বিয়ে হল পাড়ারই এক এটর্নির ছেলের সঙ্গে। আচ্ছা ভাই, খুলেই বলছি তবে—শোভনারাণী আমারই গৃহিণী হলেন। প্রফুল্লকে দু-চার বার দেখেছি, হিমাদ্রিকেও জানি—কোর্টে যে সব কথা বেরিয়েছিল, তোমাদের দশজনের মতো আমার তো জানা আছেই—

বরঞ্চ অনেক বেশি জানি। শোভনা আমার সঙ্গে এই সব অনেক গল্প করেছে, এখনও করে থাকে। তবু এই বিয়েয় বাবা সাগ্রহে মত দিয়েছিলেন, কারণ এটর্নি হিসাবে হরিকেশবের ব্যাঙ্কের খবর তিনি ভালরকম জানতেন। আর হরিকেশবের ঐ একমাত্র মেয়ে। তবে মোটের উপর এ বিয়েয় ঠকি নি —শোভনা লক্ষ্মী মেয়ে। বাবা মরে গেছেন, মা-ও নেই—কিন্তু শোভনা আমার গায়ে একটুকু আঁচ লাগতে দেয় না, এমনি করে আগলে থাকে।

তারপর বছর দশ-বারো কেটেছে। বুড়ো হয়ে ইদানীং শ্বশুর মশায় সুন্দরবনের বিষয় নিয়ে একেবারে ক্ষেপে উঠেছেন। পুরো শীতকালটা তিনি সেখানে থাকেন। দশ-বিশ ক্রোশ দূর থেকেও চাষারা এসে তাঁর আবাদে ঘর বেঁধে বসবাস করছে। হুকুম দিয়ে দিয়েছেন, হাসিলি জমিতে যারা আবাদ করতে আসবে, প্রথম তিন বছর তাদের খাজনা তো এক পয়সা লাগবে না, উপরন্তু বিঘা প্রতি দশ টাকা হিসাবে সাহায্য করা হবে। অবশ্য যে আসবে, তার চাষী হওয়া চাই, তাকে নিজ হাতে চাষ করতে হবে। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। পূব-পশ্চিমে লম্বা একটা মিঠা জলের দীঘি করে দেওয়া হয়েছে—তার নাম হরিসাগর—তারই কিনারে চাষীদের প্রকাণ্ড উপনিবেশ গড়ে উঠেছে।

আমি কখন আবাদে যাই নি, লোকজনের মুখেই শুনতে পাই। একদিন হঠাৎ কানে গেল, শ্বশুরমশায় ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে বলছেন—দেশের ছোটবড় সবাই প্রশংসা করছে, খবরের কাগজওয়ালারা ছবি ছাপাচ্ছে, আমার কিন্তু এ-সব কিছুতে মন ওঠে না ম্যানেজারবাবু। বুড়ো হয়েছি, আর ক'দিন বা বাঁচব—চোখ বুজলে সমস্ত উড়ে পুড়ে যাবে, এ আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ছেলে হলেও ঐ, জামাই হলেও ঐ—লেখাপড়া শিখেছেন,

বুদ্ধি আছে, কাজকর্ম করবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু বাবাজি একটা দিন জিজ্ঞাসা করে দেখেন না—কি হচ্ছে হরিকেশবপুরের আবাদে ?

ম্যানেজার বললেন, তা আপনি একবার বলে দেখলে পারেন।

শ্বশুরমশায় বললেন, ক্ষেপেছেন ম্যানেজার বাবু ? এ-সব কি ধরে বেঁধে হয় ? কি থেকে কি হয়েছে, আপনার কিছুই অজানা নেই। রাতে আলো নিভিয়ে আমি ঘুমোই না—নানারকম মতলব ভাঁজি। ওদের যদি এইদিকে মতিগতি হত, জমিদারি বিশগুণ হতে পারত। বলুন, ঠিক কি না ?

শুনে আমার খুব কষ্ট হল। সুন্দরবনের প্রান্তবর্তী সেই নূতন উপনিবেশেও বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। শহরে বসে দেশের কাজ করার চেয়ে সেখানে একটা কাজে লেগে যাওয়ায় অধিক মনুষ্যত্বের পরিচয়। শ্বশুরমশায়ের কাছে পরদিনই নিবেদন করলাম, আপনার কাজ নিয়ে আমি জীবন কাটাব। আদেশ করুন, আমি কালই হরিকেশবপুরের আবাদে চলে যাই।

তিনি সবিস্ময়ে বললেন, নোনারাজ্যে চাষাভূষোর সঙ্গে থাকতে পারবে তো বাবা ?

আমি বললাম, আশীর্বাদ করুন।

আশীর্বাদ কি, আমার যে বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে হচ্ছে। দেখে এসোগে, ক্ষ্যাপা বুড়ো জঙ্গলরাজ্যে ইন্দ্রপুরী বানিয়েছে। না-ই যদি টিকতে পার, ফিরে চলে এসো। তবু দু-চার দিন যা থাকবে, জীবনের একটা অভিজ্ঞতা হবে।

কিন্তু শোভনার ভয়ানক আপত্তি। প্রায় চোখের জল পড়ে আর কি ! বলল, আবাদে যাবে কি গো ! জানো, সেখানে খাবার-দাবার কিচ্ছু পাওয়া যায় না···না খেয়ে থাকতে হবে—

আমি বললাম, সেখানে ধান পাওয়া যায়। লোকে আর কিছু

না হোক—ছুটো ভাত খেতে পায়। তোমার এই শহরে যে তা-ও জোটে না। কত লোক এখানে না খেয়ে থাকে, জান?

তখন শোভনা বলল, শুনেছি সেখানে ভয়ানক ম্যালেরিয়া—

শ্বশুর মশায় যখন চর-দখল করতে যান, সে সময়ে সাঁইত্রিশটা মাথা ফেটেছিল, সেটা শুনেছ তো? খুনোখুনি সেখানে লেগেই আছে। ওটা কি ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ বলে ধরবে?

শোভনা সভয়ে বলল, তবে দেখ, খুনীদের মধ্যে তুমি যাবে কোন্ সাহসে?

আমি বললাম, তোমার বাবাকে তারা ঠাকুর বলে মানে। সেই ঠাকুরের জামাই যাচ্ছেন···বুঝে দেখ ব্যাপারটা। আমি তো বিবাদ করতে যাচ্ছি নে, যাচ্ছি তাদের মানুষ করে তুলতে। আমার সেখানে ভয় কি?

এই সব আলোচনার ফলে আবার নূতন বিপত্তি ঘটল। শোভনা ধরে বসল, সে-ও যাবে। বাপের কীর্তি তার নিজের চোখে দেখবার ইচ্ছা। আমি বললাম, বেশ তো—আগে বাবার মত নিয়ে এস। নিশ্চিত জানি, পরের ছেলে পাঠাতে যত উৎসাহ, নিজের মেয়ের বেলায় তা থাকবে না।

বুড়ো কিন্তু এক কথায় রাজি। কেবল আমি নই—ম্যানেজারবাবু অবধি অবাক হয়ে গেলেন।

এর পর শোভনাকে ঠেকায় কে! লিখে দেওয়া হল, কাছারির বড়-বোটখানা যেন স্টিমার-ঘাটে হাজির থাকে। যথাকালে হরিকেশবপুরে পৌঁছান গেল। দেখলাম, ইন্দ্রপুরী বটে! ভয়ের কিছু নেই—যত আজগুবি কথা বাইরে থেকে রটে। জঙ্গলের আরম্ভ একটা মাঝারি-গোছের খালের ওপার থেকে। এপারে এক ছিটে জঙ্গল নেই—ধানের আবাদ। কাছারিবাড়ি দোতলা, উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। নায়েব খাজাঞ্চি পাইক—

তিনটে বন্দুক, মাইনে-করা পাঁচ ছ-জন শিকারি—চারিদিক গমগম করছে। কলকাতা শহরেরই মতো এ জায়গা নিরাপদ।

হরিসাগর কাছারির নিকটেই। আমি ও শোভনা দীঘির ধারে বেড়াতাম। সারবন্দি প্রায় শ'দেড়েক চাষীর বাড়ি—বেড়াতে বেড়াতে কারও উঠানে গিয়ে উঠি, তাদের সঙ্গে গল্প করি, কখনও বা দাওয়ায় উঠে বসি। তারা পান দেয়, তামাক সেজে দেয়, কলাপাতার ঠোঙায় কলকে বসিয়ে নিয়ে আসে। তামাকটা খাই নে, দা-কাটা নিভাঁজ জিনিষ সহ্য হয় না—তবে, পান-টানগুলো অনেক সময় চেয়ে-চিন্তে খাই। তাতে ওরা বড় খুশি।

ওরই মধ্যে একজন মাতব্বর গোছের আছে, তার নাম সন্ন্যাসীচরণ। লোকটির সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে, ছেলেবয়সে পাঠশালায় শিশুবোধক শেষ করেছিল, সেই গৌরবে সকলের চেয়ে সভ্যভব্য, সাধু ভাষায় ছাড়া কথা বলে না, সকলের আগে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে। একদিন আমায় বলল, হুজুর, বিদ্যে না শিখলে চক্ষু থেকেও অন্ধ। বলুন ঠিক কি না। এদের অবস্থা অবধান করুন···এখানে যদি একটা পাঠশালা খুলে দেন—

প্রস্তাব শুনে শোভনা লাফিয়ে উঠল। বলে, তুমি এক্ষুণি ব্যবস্থা কর সন্ন্যাসী। মাস্টার লাগবে না, আমি পড়াব। ছেলেমেয়েগুলো কাদা ঘেঁটে আদুল গায়ে কি রকম ভাবে বেড়ায়, আমার কষ্ট হয়।

আমি হেসে বললাম, কাদা মেখে সুখ পায়, তা থেকেও বঞ্চিত করতে চাও? কিন্তু তুমি এখানে ক'দিনই বা থাকবে—শখ মিটে গেলে তারপর?

শোভনা অধীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, সে ভার আমার উপর। তুমি বাধা দিও না বলছি। সন্ন্যাসী, তুমি ছেলের জোগাড় দেখ—কাল থেকে ইস্কুল—

সন্ন্যাসীর শাস্ত্রজ্ঞান আছে। সে বলল, আজ্ঞে না। বিদ্যারম্ভ গুরুবার

—বিষ্যুৎবারে খুললে ভাল হয়। ছেলের ভার আমার উপর রইল। এত ছেলে হবে যে কাছারির বারান্দায় জায়গা হবে না।

পাঠশালা আরম্ভ হল।

নায়েব খাজাঞ্চির দিকে মুখ বাঁকিয়ে ফিসফিস করে বলেন, এ কি উৎপাত!

মনিবদের কাজের সম্বন্ধে চেঁচিয়ে বলতে সাহস হয় না। বস্তুত সকাল না হতে শিশুরা এসে তারস্বরে এমন চিৎকার শুরু করে যে অপর কাজকর্ম অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

সপ্তাহ দুই বেশ চলল। তারপর দেখি, শোভনার মুখ শুকনো—ছেলে মাত্র গোটা দশেকে দাঁড়িয়েছে। শোভনা বলে, আমি তো খুব যত্ন করে পড়িয়ে থাকি।

সন্ন্যাসীও কিছু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। বলে, সে কি কথা বলছেন মা! আপনার পড়ানোর দোষে কি আসছে না? এরা মুখ্যুর দল—বিদ্যের মূল্য বোঝে না। ছেলেপিলে গরু রাখতে পাঠিয়ে দেয়। আমি সন্ধান নিচ্ছি ভাল করে।

বিকেলের দিকে এসে বলল, সবাইকে খুব ধমক দিয়ে এলাম হুজুর। আচ্ছা—এক কাজ আছে, রাত্তিরে ইস্কুল করলে হয়, তা হলে কাজকর্মের কারো কোন অসুবিধে হবে না।

ভেবে চিন্তে দেখলাম, সেইটেই সমীচীন। সন্ন্যাসীচরণ বাড়ি বাড়ি ঘুরে বলে এল, ইস্কুল বসবে সন্ধ্যার পর থেকে। কিন্তু অবস্থার ইতর-বিশেষ হল না তাতে। যে ক'টি ছাত্র হাজির ছিল, তাদের পড়া বলে দিয়ে শোভনা ম্লানমুখে উপরে উঠে গেল। আমি জন পাঁচেক পাইক, একটা বন্দুক ও একটা হেরিকেন নিয়ে বেরুলাম পাড়ার মধ্যে।

সন্ন্যাসী আমায় দেখে চমকে উঠল, এত রাত্তিরে বেরিয়েছেন হুজুর?

পাঠশালা তুলে দেব। তার আগে হতভাগাদের দেখে আসতে চাই। বাইরে এস দেখি সন্ন্যাসীচরণ।

সন্ন্যাসী বলল, তার চেয়ে আপনি ঘরে উঠে বসুন। রাত্তিরবেলা—জায়গাটা তো ভাল নয়। মাঝে মাঝে বড়-শিয়ালের থাবার দাগ পাওয়া যায়—খাল পার হয়ে বেড়াতে আসেন ইদিকে। আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে কিছু লাভও নেই—সমস্ত কথা খুলে বলছি, আসুন।

সন্ন্যাসীচরণ চৌকিটা ঝেড়ে পুঁছে এগিয়ে দিল। বলতে লাগল, যার বাড়ি যাবেন হুজুর, মুখে কেউ 'না' বলবে না, বলতে সাহস পাবে না—হয়তো বলবে, ছেলের অসুখ—বলবে, মামার বাড়ি গেছে—এই রকম আর কি। আমার কাছেও তারা আসল কথা ভাঙে না, কাজের অজুহাত দেখায়। কিন্তু আমি সঠিক সন্ধান পেয়েছি। ছেলেপেলে কেউ আর পাঠশালায় দেবে না।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ?

গলা নামিয়ে পাইকগুলো শুনতে না পায় এমনিভাবে সন্ন্যাসীচরণ বলল, সাঁইবাবা মানা করে দিয়েছে, বুঝলেন ? বাদা-রাজ্যে বাস করে, সাঁইবাবার হুকুম না মেনে করবে কি—বলুন !

অনেক রাত অবধি সাঁইবাবার সম্বন্ধে অনেক গল্প হল।

এ এক আজব সাঁই। সন্ধ্যাবেলা তাঁর ওখানে চাষীদের মেলা বসে যায়। শুধু বাঘ-ভালুক নয়—ঘরদোর বিষয়-আশয় সম্পর্কেও তিনি পরামর্শ দেন। জঙ্গলের মধ্যে থাকেন, কিন্তু মন্ত্রতন্ত্র পড়তে দেখা যায় না। লোক বলে, সিদ্ধ পুরুষ—মন্ত্র পড়ার দরকারই হয় না, তাঁর জ্যোতিতে জন্তু-জানোয়ার এগুতে ভরসা করে না। খাওয়া-দাওয়ারও বাছ-বিচার নেই—মাছ, মাংস, পেঁয়াজ-রসুন অবধি—কে বলবে যে সন্ন্যাসী-ফকির মানুষ। সম্প্রতি সাঁইবাবা আসন পেতেছেন শেখেরটেক নামক এক জায়গায়।

দূর বেশি নয়, খাল পার হয়ে হাঁটা-পথে এই ঘণ্টাখানেক মাত্র লাগে; চাষীরা ছেলে-বুড়ো প্রায়ই গিয়ে হাজিরা দেয়। কিন্তু হাঁটা-পথে বিপদের ভয় আছে, নৌকায় যাওয়া নিরাপদ। তাতে অবশ্য সময় বেশি লাগে, ভাঁটা ধরে বড় নদী বেয়ে যেতে হয়—প্রায় একটা গোন লাগে।

এই সাঁইয়ের প্রসঙ্গে—এমন কি আমাদের সন্ন্যাসীচরণ অবধি তটস্থ হয়ে পড়ল। বলে, যাই বলুন হুজুর, লোকটা বাজে নয়—পেটে বিদ্যে রয়েছে, কথাবার্তায় পিলে চমকে যায়। যাবেন একদিন?

এর পর আরও ক'দিন ধরে অনেক চেষ্টা করা গেল, অনেক রকম লোভ দেখান হল, শেষাশেষি একদিন পাইক দিয়ে জন আষ্টেক চাষীকে কাছারি ধরে নিয়ে এলাম। তারা হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। বলে, হুজুর, সাঁইবাবা রাগ করলে রক্ষে আছে? খাল পার হয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় বড়-শিয়াল আবাদে এসে উঠবে; মানুষ-জন, গরু-বাছুর—কিচ্ছু রাখবে না। শুধু কি তাই? রোজ রাত্রে বাদা থেকে দানোরা হাঁক পাড়বে। এসব একেবারে প্রত্যক্ষ ব্যাপার হুজুর। বাবার দয়া আছে, তাই নির্ভয়ে টিকে আছি।

বস্তুত এরকম অপমান চুপ করে সহ্য করা যায় না। শোভনা তো গোঁ ধরেছে, কলকাতায় ফিরবে। আবার মুশকিল হয়েছে, সম্প্রতি দুটো জরুরি কাজ হাতে নিয়েছি—একটা ডাক্তারখানা খোলা হবে এবং আবাদের উত্তর দিক দিয়ে নূতন একটা জল-নিকাশের পথ করা হবে। নূতন খালের জন্য জমির মাপ-জোপ হচ্ছে, এখন কলকাতায় ফিরলে এ বৎসর আর কিছু হবে না, বর্ষা এসে যাবে। তারপর ভবিষ্যতে কবে যে উদ্যোগ হবে,—আদৌ হবে কিনা, কে জানে!

সন্ন্যাসী প্রায়ই বলে, হুজুর, চলুন একদিন সেখানে। সাঁইবাবা—যা ভেবেছেন—বাজে লোক নন; বুঝিয়ে সুজিয়ে বললে ঠিক মত হয়ে যাবে।

অনেক রকম বিবেচনা করে একদিন সকালবেলা বোট ভাসিয়ে চললাম শেখেরটেকে। শোভনাও সঙ্গে যাচ্ছে—বেচারির বড় কষ্ট, কাজ-কর্ম নেই, ···দিন-রাত আটকা থাকতে হয়। পৌছুতে দুপুর গড়িয়ে গেল। নেমে প্রায় রাশিটাক নোনা কাদা—তারপর গুলোবন। শোভনা ও জনকয়েক পাইক বোটে রইল। অনেক কষ্টে আমরা অবশেষে উঁচু ডাঙায় উঠলাম। সামনে অতি প্রাচীন এক বকুলগাছ ; এ গাছ এ রাজ্যের নয়, কি করে এসেছে কে জানে! বকুলগাছের উপর কাঠের মাচা, তার উপর গোল-পাতার ছাউনি। সন্ন্যাসী দেখিয়ে দিল—ঐ সাঁইবাবার বাসা।

তলায় অনেকখানি পরিষ্কৃত ভূমির উপর সাঁইয়ের আসন হয়েছে। সারা রাত্রি বাইন-কাঠের আগুন জ্বলে, এখনও অল্প অল্প আগুন রয়েছে, চারিদিকে ছাইয়ের স্তূপ। সে সময়টা বাবার সেবা হচ্ছে, মাটির থালায় ভাত আর রাশীকৃত মাছ-ভাজা। মোটের উপর বোঝা যাচ্ছে, তিনি থাকেন ভাল।

সন্ন্যাসী বলল, কেমন আছ বাবা ?

হুঁ—বলে সাঁই ঘাড় কাত করল। এর অধিক বলবার ফুরসৎ নেই।

সামনে দুর্ভেদ্য বন। গাছপালা এমন ঘন-সন্নিবিষ্ট যে মানুষ তো পাছের কথা, একটা কাঠবিড়ালের পথ নেই। সন্ন্যাসী বলল, ঐ জঙ্গলে নাকি দোতলা ইটের বাড়ির ভগ্নাবশেষ আছে, অতীতকালে কোন শেখেরা বাস করতেন, এখন বাঘের আড্ডা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর ধীরে সুস্থে সাঁই সামনে এসে বসল। বড় বড় চুল ও একমুখ দাড়ির মধ্যে উজ্জ্বল দুটো চোখ দেখতে পাওয়া যায়। সাঁই বলল, কি গো, বাদায় গাছাল দিতে যাচ্ছ বুঝি ? তা ফিরবার দিন মাংস দিয়ে যেও। নির্ভয়ে চলে যাও।

সন্ন্যাসী বলল, আমরা শিকারে যাচ্ছি না বাবা। চক হরিকেশবপুরের হুজুর এসেছেন তোমার কাছে। দাঁড়িয়ে রয়েছেন, পিঁড়ি দাও।

সাঁই পিঁড়ি তো দিলই না—বরঞ্চ দেখলাম, তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। বলল, হুজুর কি জন্যে? এটা চকের এলাকার বাইরে, তা জান? খাজনার জুলুম এখানে চলবে না।

কথা শুনে বিরক্তির সীমা রইল না। বললাম, চকের এলাকার মধ্যে তুমিই বা কেন জুলুম কর শুনি? প্রজাদের জন্য ইস্কুল করেছি, ইস্কুলে ছেলে হয় না। শুনতে পাই, তুমি এখান থেকে কু-মতলব দেও।

সাঁই হি-হি করে হাসতে থাকে। বলে, এই কথা? তা চটছ কেন গো? আমি তো ভাবলাম, খবর শুনে আমাকে বখশিস দেবে—

লোকটি বারবার আমার দিকে তাকায় আর হাসে। আমার বড় অস্বস্তি ঠেকে। বলতে লাগল, এত বড উপকার করে দিচ্ছি, গাঁজা-টাজার দরুণ দু-এক টাকা বখশিস পেতে পারি না কি?

উপকার?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি যে এখানে আর একটি ইস্কুল করেছি, তা জান না বুঝি! তোমাদের আর কষ্ট করতে হবে না।

কি শেখাও? বই-টই আছে?

আছে বই কি। হরেক মজার বই। দেখবে?

গাছের দোডালা থেকে সে চার-পাঁচটা গাঁজার কলকে বের করল বলতে লাগল, বোকার মতো কাজ কর কেন। জমিদারি আর ইস্কুল এব · সঙ্গে চলে না।

লোকটার কথাবার্তার ধরণে এখন বিরক্তি গিয়ে আমার মজা লাগছিল বললাম, কেন চলবে না? প্রজারা লেখাপড়া শিখুক, মানুষ হোক, এই তো আমরা চাই—

সাঁই হাসতে হাসতে বলল, মানুষ হয়ে গেলে জানোয়ারের কাজ করবে কে?

জানোয়ার? জানোয়ার কারা?

ঐ যাদের জন্য এত দরদ দেখাচ্ছ। জানোয়ারের চেয়েও অধম। বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর কঠোর কর্কশ হয়ে উঠল, মুখে আর হাসির রেখা মাত্র নেই। বলে, মহিষে তোমাদের জমি চষে, চাষীরাও চষে—জমি তাদের কারও নয়। মহিষকে ঘাস-খড় দাও—এদের তা-ও দিতে হয় না। তবু এরা সর্দার-মহিষ, লাঙ্গল-টানা মহিষের উপর খবরদারি করে কিনা!

চুড়ির শব্দ ও শাড়ির খসখসানিতে পিছনে চেয়ে দেখি, পাইকদের নিয়ে শোভনাও নেমে এসেছে। ভরা জোয়ার; আমাদের হাত কয়েক মাত্র দূরে কেওড়াতলায় জল ছলছল করছে। বোট খুব কাছে এসেছে, ফিরবার সময় আর নোনা কাদার দুর্ভোগ ভুগতে হবে না।

চেয়ে দেখি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শোভনা সাঁইকে লক্ষ্য করছে। সাঁই কিন্তু তাকিয়েও দেখে না, যেন ইচ্ছা করেই তাকে অবহেলা করছে। আমি উদ্ধত কণ্ঠে বললাম, কচি ছেলেগুলোকে ইস্কুল ছাড়িয়ে গাঁজা ধরাচ্ছ ঠাকুর, আমি ছাড়ব না, পুলিশ এনে বুজরুকি ভেঙে দেব। রোসো—

সাঁই ভয় পায় না। সহজ ভাবেই বলতে থাকে, তারা আমোদে থাকে হুজুর, খুব খাটতেও পারে। দেখ, মহিষকে মানুষ করতে যেও না। তাতে অসুবিধা বিস্তর, তোমাদের তাসের ঘর ভেঙে পড়বে।

আবার রাগ করে কি বলতে যাচ্ছিলাম, পিছন থেকে শোভনা আমার জামায় টান দিল। তার চোখ মুখে অস্বাভাবিক উত্তেজনা। বলল, প্রফুল্লবাবু যে! চিনতে পারছ না?

কোন্ প্রফুল্লবাবু?

আমার দাদা। দুঃখের ধাক্কায় ধাক্কায় দাদা এ কোথায় এসে পড়েছেন! চিনতে পারছ না?

মনে পড়ল। কিন্তু অনেক করেও হরিকেশব দত্তর গৃহ-শিক্ষক প্রফুল্লর সঙ্গে সুন্দরবনের এই সাঁইবাবার সাদৃশ্য আবিষ্কার করতে পারলাম না। তবু শোভনা তাকে চিনেছে। বলল, কি সর্বনাশ, আপনি এখানে প্রফুল্ল-দাদা? এই অবস্থায়?

তারপর ক্রমশ ওদের আলাপ-পরিচয় সহজ হয়ে এল।

প্রফুল্ল বলে, কেন, মন্দটা কি আছি? এখানকার পড়শিরা একটু গোঁয়ার বেশি,—ঘাড় মটকায়, রক্ত শুষে মারে না।

শোভনা কাঁদ-কাঁদ গলায় বলে, আপনাকে ছাড়ব না দাদা, আপনি আমার বড় ভাই। আপনাকে সঙ্গে করে কাছারি বাড়ি নিয়ে যাব। সেখান থেকে নিয়ে যাব কলকতায়।

প্রফুল্ল হাসতে হাসতে বলে, গ্রেপ্তার করছ বোন? জঙ্গলে বসে চাষা ক্ষেপাচ্ছি বলে?

ওসব বলে রেহাই পাবেন না দাদা। চলুন কাছারি।

দয়া?

শোভনা বলল, ঐ আপনার এক কথা! সংসারে স্নেহ-মমতা কি কিছু নেই? আপনি বড় দুর্ভাগ্য, সংসারের রূঢ় রূপটাই শুধু দেখেছেন।

সাঁইয়ের কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে এল।

আমি ভাগ্যবান বোন, সংসারের সত্য রূপ দেখেছি। কোন মিথ্যা মোহ নাই আমার। স্নেহকে আমি ডরাই, দানকে আমি ঘৃণা করি। ঐ যে ইস্কুল করেছ, আমি ছেলেদের সরিয়ে নিচ্ছি কেন জান? সত্যি কথাটা বলি তবে,—ঐ দয়ার কুয়াসা তোমাদের খাঁটি চেহারা দেখতে দেয় না। তোমাদের পায়ের আঘাত সইতে পারি, কিন্তু দয়া দেখলে ভয় পাই। এ যেন ডাকাতি করে লাখ টাকা নিয়ে দশ টাকার দানসত্র করে দেওয়া। এর দরকার নেই, কোন দরকার নেই।

শোভনা কাছে গিয়ে সাঁইয়ের হাত জড়িয়ে ধরল।

আপনাকে ছাড়ব না দাদা, নিয়ে আমি যাবই। নয় তো মাথা খুঁড়ে মরব।

সাঁই হেসে উঠে বলল, না—তা কোরো না। ঐ যে ডজন খানেক পাইক রয়েছে সঙ্গে, ওদের হুকুম দিয়ে দাও—কোমরে দড়ি বেঁধে আগে-পিছে সঙ্গিন উঁচিয়ে টেনে নিয়ে যাক। সেটা প্রাঞ্জল ব্যাপার—সহজে বুঝতে পারা যায়···

একেবারে নাটকীয় ব্যাপার! এর অনেক দিন পরে এক বর্ষা-সন্ধ্যায় আমাদের কলকাতার মজলিসে এই গল্পটা করেছিলাম। গরম সিঙাড়া ও চায়ের সহযোগে বন্ধুরা সকলেই উপভোগ করছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন নি একজনও। বিশ্বাস আমিও করতে পারি নি। শোভনার সঙ্গে এত কথাবার্তা হল, এত জবরদস্তি করে সাঁইকে সকলে বোটে তুলল—সমস্তক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল, এ একটা অবাস্তব কৌতুককর ব্যাপার, আমি তার নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র।

এই সব হাঙ্গামায় সন্ধ্যা হয়ে গেল, জোয়ার শেষ হতে বেশি বাকি নেই। আবার জোয়ার আসতে রাত দুপুর—সেই অবধি অপেক্ষা

করতে হবে। অবশ্য, অসুবিধা এমন কিছু নেই। সঙ্গে বন্দুক ও লোকজন আছে, নদীর মধ্যে অনেকটা দূরে নোঙর ফেলা হয়েছে, মহা আয়োজনে রান্নাবান্না চলেছে। শোভনার উৎসাহের অবধি নেই। তার দাদাকে যত্ন করে খাওয়াবে, নিজে উনানের ধারে বসে সমস্ত তদারক করছে। খাওয়া-দাওয়ার অনেক পরে জোয়ার এল। আমরা শুয়ে পড়েছি। স্রোতের বেগে বোট দুলে দুলে ছুটেছে।

ঘুমের ঘোরে হঠাৎ শুনতে পেলাম, ঝপ্‌পাস করে এক শব্দ।

ওরে, কে পড়ল রে?

সাঁইবাবা জলে ঝাঁপ দিয়েছে।

কি সর্বনাশ! শোভনা তাড়াতাড়ি কামরা থেকে ছুটে বেরুল। আমিও বেরুলাম। ব্যাকুল কণ্ঠে শোভনা ডাকতে লাগল, ফেরো দাদা— ফিরে এস। ওরে, তোরা দাঁড় তোল্, বোট ঘুরিয়ে নে—

প্রফুল্লর জবাব শুনতে পেলাম, না—তোমরা যাও। তোমাদের দেশ আমার জন্য তো নয়।

ইতিমধ্যে একজন পাইক টর্চ এনে আমার হাতে দিল। নদীর উপর আলো ফেললাম। কালো জল সুতীব্র আবেগে ঢেউ তুলে ছুটেছে। নদীকূলে অনেক দূরে ঝাপসা-ঝাপসা গাছপালা।

শোভনা কেঁদে ফেলল। বলল, ও দাদা, পায়ে পড়ি—ফিরে এস। বনে বাঘ, জলের মধ্যে কুমীর-কামট—

কিন্তু বোন, মানুষ নেই।

আর তার কথা শুনতে পেলাম না। জোয়ারের টানে কতদূরে গিয়ে সে ডাঙায় উঠল,—কিম্বা আদৌ উঠল কিনা, আজও কোন সন্ধান পাই নি।

ইয়াসিন মিঞা

ভোঁ—ভোঁ—ভোঁ-ও-ও-ও—

গল্প হচ্ছিল, গল্প ছেড়ে সাধুচরণ লাফিয়ে উঠল। রেলিঙের ধারে গিয়ে দেখতে লাগল। এঞ্জিন-ঘরে কল চলেছে, খটাখট খটাখট—পিছনের চাকা জল তোড়পাড় করছে, স্টিমার তবু নড়ে না।

কি হল, সারেং মশায় ?

মাদুর পেতে শুয়ে পড়োগে···কাচিপাতায় আজ রাত ফরসা হবে।

চাকা ছেড়ে দিয়ে সারেং নিচে নেমে গেল। এঞ্জিন নিঃশব্দ হয়ে এল। কয়লার ঘরের ওদিকে খালাসিরা রান্না চাপিয়ে দিল।

মুশকিল হয়েছে বারিধি সেনের। ফার্স্ট-ক্লাস প্যাসেঞ্জার বারিধি—কিন্তু করবে কি, খানিক এদিক-ওদিক করে কেবিনে ঢুকল। কাঁদো-কাঁদো গলায় নন্দা বলে উঠল, সর্বনাশ! এখন উপায় ?

উপায় নেই। স্টিমার চড়ায় আটকে আছে। জোয়ার না আসা অবধি এই দশা।

অধীরকণ্ঠে নন্দা বলতে লাগল, খালাসিদের বল না—জলে নেমে ঠেলে দিক—

মানুষ ও বলদে মিলে একবার স্টিমার নয়—একখানা মোটরগাড়ি মাঠের উপর দিয়ে অনেক দূর ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল, নন্দা তা জানে। তখন বারিধি বিলাত থেকে ফিরে নূতন সরকারি চাকরি পেয়েছে, পঞ্চাশ মাইল স্পীডের কম মোটর চালায় না। সেই মোটর বিগড়ে গেল মাঠের মধ্যে। পাকা রাস্তা অনেক দূর। কিন্তু মানুষ পাওয়া

গেল; গরুও পাওয়া গেল কয়েকটা। শুকনো ধান-ক্ষেতের উপর দিয়ে গাড়ি গড়গড় করে চলল। ভিতরে বসে নন্দার হাততালি দিয়ে কি হাসি! স্টিমারও হয়তো তেমনি চালান যেতে পারে, কিন্তু মানুষ হোক, জানোয়ার হোক—এতগুলি এখন মিলবে কোথায়?

নন্দার হাত ধরে বারিধি পাশে বসাল, মাথাটি কোলের উপর টেনে নিল। সজল চোখে নন্দা কেবলি বলছে, ওগো, বল না খালাসিদের, বল না। না হয় বখশিস দেওয়া যাবে।

পাগল!

পাগল মানে? নন্দা এবাব রুখে উঠল। কখন পৌঁছুব তা হলে? এগারটায় লগ্ন···সেজদি এসেছে, নিভা, লিলি সবাই এসে গেছে, কত আমোদ-ফূর্তি হচ্ছে। মাথা খুঁড়ে মরলাম যে দুটো দিন আগে চল যাই। আমার ভাগ্যে নেই, সে জানি।

বারিধি সস্নেহে চোখ মুছিয়ে দিল।

আহা, কাঁদছ কেন? অমন করে কাঁদে না। শোন, আমার দিকে তাকাও—কথা শোন লক্ষ্মিটি!···আচ্ছা, আমার কি দোষ—ছুটি তো পেয়েছিলাম, কিন্তু কোরবানি নিয়ে দাঙ্গা বেধে গেল, সদর ছেড়ে তখন যাওয়া যায়?

ছোট খুকিটির মতো মাথা দুলিয়ে নন্দা আবার বলে, তুমি খালাসিদের বল। বলে একবার দেখই না কেন—

দরজায় টোকা। ইয়াসিন মিঞা চায়ের টেবিল নিতে এসেছে।

ডলি কোথায় ইয়াসিন?

পুতুল খেলছেন দু-নম্বর কেবিনের খোকাদের সঙ্গে। ডেকে দেব?

স্বরের অনুকৃতি করে নন্দা বলে উঠল, ডেকে দেব!···যার তার সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে, তুমি কিচ্ছু দেখ না—উল্লুক কোথাকার!

নিচে গিয়ে ইয়াসিন মিঞা তো হেসেই খুন। ডাকছে, সাধুচরণ গো!

সাধু বড় শুকনো মুখে আসছিল। বলল, মিঞা ভাই, চাল দিতে পার সেরখানেক? গেরো কেমন—খালাসি বেটারা তাদের সব চাল চাপিয়ে বসে আছে, এখন ভাঁড়ে মা ভবানী।

ইয়াসিনও তেমনিভাবে প্রশ্ন করল, সাধু ভাই, বিচালি দিতে পার কাহনখানেক?

বিচালি?

জোয়ারের মুখে বাঁধ দিতে হবে গো। খালি হাতে হচ্ছে না। বলতে বলতে হাসিতে সে শতখান হয়ে পড়ল। গলা নামিয়ে বলল, মজা হয়েছে সাধু, বিবি কাঁদছে, সাহেব একেবারে দু-হাতে মোছাতে লেগেছে। হি-হি-হি—জামা-পেণ্টলুন সমস্ত এই ভিজে জবজবে!

বিষম উৎসাহে চোখ বড় বড় করে সাধু বলল, সত্যি রে?

ইয়াসিন বলল, দেখতে চাও? এ রকম বিশটা সাহেবের চাকরি করেছি—কত দেখবে! হিঁদু জাতের হেনস্তা কত!

সাধুচরণ গম্ভীর হয়ে গেল। ইয়াসিন কিছু অপ্রতিভ হয়েছে। সাধুচরণও হিন্দু, ঝোঁকের মাথায় তা খেয়াল ছিল না। খালাসিদের একজন গোটা দুই মুরগি রেখে গেল। রাত যখন স্টিমারেই কাটবে, রাতের বন্দোবস্ত চাই-ই।

মুরগির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ইয়াসিন বলল, রাগের কি হল, ভাই? অনেক দেখে শুনেই বলি। জাত কি নেই?

সাধু দুঃখিতভাবে বলতে লাগল, তুমি কথায় কথায় জাত তোল ইয়াসিন মিঞা। ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি লাগালে চোখ না মুছিয়ে করবে কি শুনি?

দমাদম দুটো লাথি দেবে পিঠের উপর। চোখের পানি কোথায়

উড়ে যাবে! ইয়াসিন বুক ঠুকে বলতে লাগল, গরু আর জরু সায়েস্তা রাখা মরদের কর্ম। সে জানত ইসমাইলের মা—সোয়ামি কারে বলে!

বীরত্বে বাধা পড়ে গেল মুরগির ডাকে। নিরীহ খোদার জীব দু-টাকে ধরে ইয়াসিন দিল এক আছাড়।

রজনীকান্ত সাঁপুই মশায়েরও বিপদ ভয়ানক। চাল বাড়ন্ত খবর শুনে অধীর হয়ে উঠেছেন। বার বার বলছেন, তা হোক,—তা হোক সাধুচরণ, তুই একবার খোঁজ করে দেখ্ না—খালাসিদের মধ্যেও তো বামুন-টামুন থাকতে পারে। যে দিন-কাল পড়েছে, কোথায় কোন্ নৈকষ্য কুলীন ঘাপটি মেরে আছেন, কিচ্ছু বলা যায় না। দুটো চাল সিদ্ধ করে দিক, প্রাণটা তো বাঁচুক—না হয় কিছু পয়সাই নেবে।

বড় মহাজন এই সাঁপুই মশায়—অতিশয় নিষ্ঠাবান। বড়দলে একটা কেরোসিনের ডিপো খুলতে চান, ইদানীং তাই এদিকে খুব আনাগোনা করতে হচ্ছে। আরও ব্যাপার হয়েছে, সম্প্রতি দীক্ষা নিয়েছেন—অজাত-কুজাতের ছোঁয়া-খাওয়া একদম চলে না। নিজে রান্নায় অপটু, আজ দু-দিন চিঁড়ে-দুধ খেয়ে আছেন। স্টিমারে উঠে আধ-শুকনা ক'টা কমলানেবু পেয়েছিলেন, সে সমস্ত উড়ে গেছে বেলা তখন সাড়ে দশটা। খুলনার বাসায় চিঠি লেখা আছে, এতক্ষণে হেরিকেন নিয়ে কেউ না কেউ ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে, একবার পৌঁছুতে পারলে গরম গরম মাছের ঝোল ভাতের কিছুমাত্র অন্যথা হত না।

হঠাৎ চেনালোক দেখে সাঁপুই একটু ঠাণ্ডা হলেন। লম্বা-চওড়া লোকটি, একমুখ দাড়ি।

কাজি সাহেব না? খুলনায় যাচ্ছেন, আবার ফৌজদারি বাধিয়েছেন বুঝি! তারপর, আছেন কেমন?

কাজি সাহেব বললেন, আর বলেন কেন? আবার দুটো মহল ইজারা নিয়েছি—নাকানি-চুবানি খাইয়ে দিচ্ছে। গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, বড় শালাজ চলেছেন ঐ দু-নম্বর কেবিনে; বড় কুটুম্বটিও আছেন সঙ্গে।

আগ্রহের স্বরে রজনীকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন—খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হল, সাহেব? জোয়ার আসবে তো রাত দুপুরে—সমস্ত রাত ভুগতে হবে।

দূরের কেবিনের দিকে দৃষ্টিপাত করে কাজি সাহেব বললেন, চুপ! সেই সন্ধানেই যাচ্ছি। সুবিধে পাই তো অমনি সেরে-সুরে মুখ মুছে চলে আসব। কেবিন ভরতি ছেলেপুলের পল্টন—তিনটে টিফিন-কেরিয়ার শেষ করে রেখেছে। খবর পেলে পঙ্গপালের মতো পড়ে ওদের থালা-বাটি ছুরি-বঁটি অবধি খেয়ে সাবাড় করে যাবে।

কাজি সাহেব আর দাঁড়ালেন না। রজনী মনে মনে বললেন, এদের কি—যেখানে হোক ভাত পেলেই হল, কাকের মতো খুঁটে খেয়ে নেয়। এই যে এত বুড়ো হয়ে গেছে কাজি সাহেব, তা বলে বাছ-বিচার আছে! সাধুচরণের দিকে চেয়ে বললেন, এক কাজ করলে হয় সাধু, বামুন যদি নাই জোটে—ঐ ওদের কাছ থেকে বাসন-পত্তোর নিয়ে ভাল করে মেজে ধুয়ে তুই দুটো চাপিয়ে দিগে বরং—

আমি রাঁধব?

প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। বিশেষ এই গঙ্গার উপর—কে দেখছে? কাচিপাতা গাঙ—জল নোনা, বিষের মতো কটু। সে যাই হোক সকল নদীই যখন সাগরে পড়েছে, গঙ্গার সঙ্গে যোগাযোগ একটা আছে বই কি।

কিন্তু রান্নার ব্যাপারে সাধুও সমান ওস্তাদ। চট করে তার মাথায় নূতন এক বুদ্ধি খেলে গেল, চলল ইয়াসিনের খোঁজে। ইয়াসিন আলুর

খোসা ছাড়াচ্ছে, ফ্রক-পরা ফুটফুটে ছ-সাত বছরের একটি মেয়ে সামনে। ইয়াসিন বলছে, ফুলুরি খাবে ডলি-বাবা? তেলে-ভাজা রাঙা রাঙা ফুলুরি—কাল ঘাট থেকে এই এত্তো কিনে রেখেছি।

দাও, দাও। ডলি কাছ ঘেঁষে এল।

নিষ্ঠুর ইয়াসিন—লোভ দেখায়, কিন্তু দেয় না। বলে, ঈস, শখ দেখে বাঁচি নে। ফুলুরি খাবেন! কুত্তার মতো তোমরা রুটি-মাখন ছিঁড়বে —ফুলুরি খেতে হলে কপাল করে আসতে হয়।

এত সব বুঝবার বয়স ডলির নয়। অধীর কণ্ঠে বলল, দেবে না?

জাতভাই ছাড়া ইয়াসিন মিঞা কাউকে কিছু দেয় না; আর ভিন-জাত হ'লে ছেড়ে কথা কয় না। তবে বদলি পেলে দিতে পারি। এক ডজন বিস্কুটে এক একখানা ফুলুরি। চুপি-চুপি নিয়ে এসোগে, তোমার মার বাক্সে আছে। আমার নাম করে বোসো না কিন্তু। বুঝলে?

ঘাড় নেড়ে চঞ্চল পায়ে ডলি ছুটল।

সাধুচরণ বলল, কি চড়িয়েছ, মিঞা সাহেব? খাসা গন্ধ বেরিয়েছে তো!

ও তো হল নিরামিষ···হেঁ-হেঁ—ইয়াসিন সগর্বে ঘাড় নাড়তে লাগল। বলল, এই দেখছ, আর মাংস চাপালে বাস বেরুবে কি রকম দেখো। আমার ইসমাইল তো তুড়িলাফ শুরু করে দেয়।

ইসমাইল ছেলে? ক'টি ছেলে তোমার?

হুঁ। বলে ইয়াসিন একটু অন্যমনস্ক হল। বলতে লাগল, সেই চোত মাসে এসেছি, তারপর আর ছুটি দিতে চায় না। জাত-ভাই নয়—দরদ বুঝবে কেন? কালকে খবর দিয়ে পাঠিয়েছিলাম—কুড্ডুল-মারির ঘাটে এসে ঠিক সে বসে আছে। এই পাঁচ-ছ'খানা বাঁকের পর—এতক্ষণ কোন্ কালে পৌঁছে যেতাম! হারামজাদা যে কি রকম তামুক টানতে শিখেছে—তুমি বললে বিশ্বাস করবে না সাধু-ভাই। আমি

বলি, তামুক খাস কেন—ও ভাল না—বিস্কুট খাস, ডজন ডজন পাঠিয়ে দেব।

মা-হারা অসহায় ছেলে, দূর-সম্পর্কের এক ভাবীর কাছে পড়ে আছে। পেট ভরে খেতে পায় না, মারধোর খায়,—পাড়ার এক পাল গরু নিয়ে মাঠে মাঠে বেড়ায় ; ইয়াসিনের টাকা পাঠাতে দেরি হলে ঘাড় ধরে তাকে বাড়ির বের করে দেয়···তরকারি কোটা ইয়াসিনের খানিক বন্ধ হয়ে রইল।

মাস্টারমশায়, মাস্টারমশায়, তোমার কচুবনে লোক ঢুকেছে।

হাঁক দে না।

মুখ ভরতি গোপাল-মাস্টারের ; এর বেশি কথা বেরুল না।

ইসমাইল হাঁক দিল, কেডা তুমি? হোই গো—ও মাস্টারমশায়, যায় না যে !

মাস্টারমশায়ের তা বলে উঠে দেখবার ফুরসৎ নেই, গলদা-চিংড়ির ঘি বের কচ্ছেন। দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, গতর নেড়ে দেখ্ না এট্টু—

ঘন-সন্নিবিষ্ট আম-কাঁঠালের বাগান। তারই পাশে মানকচুর ক্ষেতে আবছা জ্যোৎস্না পড়েছে। কচুপাতা বাতাসে এক-একবার নড়ে, দেখে দেখে ইসমাইলের মনে হচ্ছে—লোক একটা নয়, অন্তত জন তিন-চার, ওখানে নিঃসাড়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। চাঁচের বেড়ার ওধারে স্টেশন-মাস্টার সশব্দে ভাত খাচ্ছেন, উনি যদি বেরিয়ে আসেন একবার···অন্তত পক্ষে দুটো-চারটে কথাও বলেন, বড্ড ভাল হয়—ইসমাইল সাহস পায় একটু। মনে মনে ভাবছে, বাপজান আজ টাকা-পয়সা যা দেবে তার থেকে একটা পয়সার মুড়ি কিনে খেতে খেতে বাড়ি ফিরব। চুপচাপ থাকল আরও কতক্ষণ, তারপর ডাকল, একটু জল দেবা, মাস্টারমশায় ?

জল? শীত কনকন করছে, জল কি হবে রে হতভাগা? হয়ে গেছে আমার—তামাক সাজ্‌ দিকি।

মহা উৎসাহে ইসমাইল তামাক সাজতে বসল। গোপাল উনুনের কাঠ থেকে আগুন ভেঙে দিলেন।

ঘা'নকাঠের আগুন রে, নিভিয়ে ফেলিস নে—দেখিস।

আজ্ঞে না। আশ্বাস দিয়ে ইসমাইল তামাক সাজতে বসল। আহারাদি সমাপ্ত করে হাত-মুখ ধুয়ে গোপাললাল এসে বসলেন। ইসমাইল হুঁকার মাথায় কলকে চড়িয়ে দিল। একটান টেনে মাস্টার বললেন, ঈস, টেনে সাবাড় করে দিয়েছিস?

কলকে ঢেলে দেখেন, তামাক পুড়ে গিয়ে গুল অবধি এসে পৌঁচেছে। কটমট করে ইসমাইলের দিকে তাকালেন।

ইসমাইল বলল, আমি তামাক খাই নে।

হুঁ।

ইসমাইল বলতে লাগল, আগুন নিভে যাচ্ছিল, টেনে টেনে তাই নিভতে দিই নি। মাইরি—

গোপাল হেসে ফেললেন, তা বুঝেছি। সাজ্‌ আর একবার—

আয়েস করে গোপাল নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

ইসমাইল জিজ্ঞাসা করল, স্টিমার আসবে কখন মাস্টারমশায়?

হাই তুলে তুড়ি দিয়ে গোপাল বললেন, কি জানি—

এট্টু হুঁকোর জল দেবা মাস্টারমশায়? ফোড়াটা বড় টাটাচ্ছে।

ইসমাইলের কাঁধের কাছে মস্ত এক ফোড়া। খানিক হুঁকোর জল ঢেলে দিয়ে গোপাল উঠে দাঁড়ালেন।

একটু গড়িয়ে নিইগে ইসমাইল। হারামজাদা স্টিমার যেন শুয়ে শুয়ে আসছে। সিটি শুনলে ডেকে দিবি। ব্যাপারিগুলো এখন হাট-

খোলায় পড়ে হল্লা করছে, শেষকালে এক সময়ে সব বেটার মরণ হবে।

চাঁচের বেড়ার ওধারে গিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। ঘাটের উপর মিটমিটে এক হেরিকেন ঝোলানো, চারিদিক নিশুতি। নদীতে ভাটার টান···জল নেমে যাচ্ছে, চরের মাটি জেগে উঠেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় ওপার থেকে উড়ে আসছে। কান খাড়া করে আছে ইসমাইল, কিন্তু স্টিমারের সিটি বাজে না।

আরও অনেক পরে—চাঁদ বুঝি অস্ত গেছে, ঘরের মধ্যে অন্ধকার। ঘুমের ঘোরে গোপাললালের মনে হল, একটা বিড়াল পায়ের কাছে শুয়ে আছে। পা বুলিয়ে দেখলেন, বিড়াল যদি হয় তো ভয়ানক লম্বা বিড়াল। জোরে এক লাথি দিতেই বিড়ালটা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

কি সর্বনাশ! গোপাল বিদেশি মানুষ, নূতন এসেছেন, গ্রামের লোকগুলোও বড় সুবিধের নয়—

কে? কে রে? ইসমাইল? তুই এখানে এসে শুয়েছিলি?

আমার ফোড়া ফেটে গেছে মাস্টারমশায়—

বেশ হয়েছে বাবা। ফোড়া তো পুষে রাখবার ধন নয়। কাঁদিস নে।

তুমি লাথি মেরে ফাটিয়ে দিয়েছ—

গোপাল মাথা নেড়ে বললেন, সে কি? কক্ষণো নয়। একটুখানি হাতড়ে দেখছিলাম। হাত দিয়ে তো দেখতে পারি নে—বামুন মানুষ, অন্ধকারে হাত যদি তোর পায়েই লাগত, কি রকম মহাপাতক হত বল্ দিকি! চুপ কর্ বাবা, ও ঘরে শুবি চল্—চালানি হোগলার আটি রয়েছে, তোফা শুয়ে থাকবি—

একশ ইলেকট্রিক আলো জলে উঠেছে। স্টিমার ঝলমল করছে। নন্দা এসে উপর থেকে ডাকল ইয়াসিন—

সাধুচরণ ইয়াসিনের হাত জড়িয়ে ধরেছে।

বলে রান্নার তা হলে ঐ বন্দোবস্ত রইল মিঞা-ভাই।

হাত ছাড়িয়ে ইয়াসিন ছুটে উপরে গেল।

পায়ের কাছে বিস্কুটের টিন, ডলি বমালসুদ্ধ ধরা পড়ে গেছে। নন্দা বলল, এই উল্লুক, নিজে তো চোরের বেহদ্দ—আবার একে শেখান হচ্ছে?

ইয়াসিন আকাশ থেকে পড়ল, বাবা তো উদিকেই যান নি।

—চুপ রও, বদমাস। স্বামীর দিকে চেয়ে নন্দা বলতে লাগল, একে তাড়াব, তাড়াব, তাড়াব। এবার ফিরে গিয়ে একটা বেলাও একে রাখব না। চার আনা ফাইন—ভাগো উল্লুক—

ইয়াসিন বারিধির দিকে হাতজোড় করে দাঁড়াল, মরে যাব হুজুর। কসুর হয়ে থাকে চাবুক মারুন, ফাইন করবেন না।

জুতার আগায় বিস্কুটের টিন ছুড়ে দিয়ে নন্দা ডলি ও বারিধিকে নিয়ে চলে গেল।

যাই হোক, বিস্কুট দিয়ে গেল তো! হি-হি-হি—। কিন্তু টিন খুঁজে দেখে তিন-চার টুকরা মাত্র। কাগজে মুড়ে সেগুলো ইয়াসিন সযত্নে পকেটে পুরল।

সাধুচরণ ফিস-ফিস করে জিজ্ঞাসা করে, ডাকছিল কেন রে মিঞা?

ইয়াসিন বলে, বড্ড পেয়ার করে কি না! তাই বলল, ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ—খালি-হাতে যেও না, বিস্কুট নিয়ে যেও। একেবারে টিনটা ধরে দিয়ে দিল। তারপর ঘাড় নেড়ে বলে উঠল, তা যাই বলুক সাধু, ইয়াসিন মিঞা কিন্তু ভিন-জাতকে ছেড়ে কথা বলবে না, আর জাতভাই ছাড়া কাউকে খাতির করবে না।

আবার জাত তোলে?

ইয়াসিন আগুন হয়ে বলল, জাত নেই না কি ?

সাধুচরণ বোঝাতে লাগল, আছে, যাঁরা বড়লোক তাঁদের আছে, তাঁদের পোযায়। আমাদের থাকলে চলে! এই ধরগে—এর আগে আমি ছিলাম হোসেন আলি সাহেবের বাগানের মালি। হোসেন আলির নাম শোন নি—ফেজ বিক্রি করে লাল হয়ে গেছে ? তাই বলি, জাত দেখতে গেলে কি আমাদের চলে ?

ইয়াসিন বলল, না সাধুচরণ, ভিন-জাতকে আমি কিছু দিই নে, সে আমার নিয়ম। তবে দাম পেলে বেচতে পারি। আলু-ভাতে ভাত আর একখানা নিরামিশ তরকারি···নগদ কিন্তু পাঁচ সিকে লাগবে। দর করতে চাও তো পথ দেখ।

আমার দস্তুরি ?

ইয়াসিন বলল, আমার পাঁচ সিকে চাই। বেশি আদায় করতে পার, তোমার। নেহাৎ দরকার পড়ে গেছে, ওদের কাছে মাইনে পাওনা মোটে দু-টাকা। ইসমাইলটা ওদিকে ঘাটে এসে বসে আছে—তাই।

সাধু রাজি হয়ে গেল। বলল, ভাত-টাত কিন্তু আমার হাতে দিয়ে দিবি। বাবু আমাদের নৈকষ্য কুলীন খুঁজে বেড়াচ্ছেন কি না, বুঝলি নে ?

নিশ্চিন্ত হয়ে হাসতে হাসতে সাধুচরণ চলে গেল।

বাঁশী বাজছে, আড়বাঁশীর মতো সুর। বাঁশী বাজায় কে ? রান্না ফেলে ইয়াসিন ছুটল। ডেকের উপর ছোট-বড় সবাই ভিড় করেছে, কাজি সাহেব পর্যন্ত। এ আল্লা! বাঁশের বাঁশী কোথায়—বিলাতি বাঁশী।···পর্দা খাটানো হয়েছে, পর্দার আড়ালে বসে বাজাচ্ছে নন্দা, আর ওদিকে ডলি নাচছে। এ নাচ এ বাঁশী ইয়াসিন ঢের ঢের জানে। আজ কাচিপাতা নদীর উপর ভুল করে ভাবল কিনা বাঁশের বাঁশী! সে কত কালের কথা, তলতা বাঁশ ছেঁদা

করে নিজের হাতে ইয়াসিন বাঁশী তৈরি করত, কেমন সুন্দর বাজাত, জ্যৈষ্ঠ মাসের খরদুপুরে আমবাগানের ছায়ায় ছায়ায় বাঁশী বাজিয়ে সে ঘুরে বেড়াত।

চাঁদের আলো তেরছা হয়ে ডেকের উপর পড়েছে। রূপার পাতের মতো নিস্তরঙ্গ নদীজল। ফার্স্ট-ক্লাসের যাত্রীরা সব মুগ্ধ চোখে খুকীর নাচ দেখছে। পাশের লোকের সঙ্গে চুপি-চুপি বারিধি বলছে, ঐ বিশেষ ভঙ্গিটা শিখতে ডলির লেগেছিল মোটে সাত মিনিট—আশ্চর্য মেধাবী মেয়ে! এক-একটা নাচের শেষে নন্দা পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে মেয়ের হাত ধরে কেবিনের ভিতর নিয়ে যায়, মিনিট কয়েকের মধ্যে আবার নূতন সাজে সাজিয়ে নিয়ে আসে।

কাজি সাহেবের কড়া নজর। এত আমোদের মধ্যেও ইয়াসিন কখন এক লহমা এসেছিল, তা দেখতে পেয়েছেন, দেখে অবধি উশখুশ করছেন। কিন্তু নাচের মাঝামাঝি উঠা বেয়াদপি। বিশেষ, যিনি জেলার মালিক তাঁরই মেয়ে নাচছে। তা ছাড়া বারিধির সঙ্গে একটু-আধটু চেনা-জানাও আছে, এবং আজ এই সুযোগে বেশি পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা রাখেন।

ইয়াসিন গিয়ে হাঁক-ডাক শুরু করল।

ওরে সাধু, দেখলি নে—লাচ হচ্ছে। বিবি বাঁশী বাজিয়ে পোলাপান লাচাচ্ছে। জোড়া-কঞ্চি কি বাঘা-বেত পেতাম যদি একটা—

কাটা মুরগি পড়ে ছিল রোস্ট হবে বলে। কি জানি কার পরে রাগ করে ইয়াসিন জোরে জোরে তারই পাখনা ছিঁড়তে লাগল।

কাজি সাহেব টিকতে পারলেন না, প্রায় তখনই এসে বললেন, হল তোমার মিঞা? পঙ্গপালের দল নাচের আসরে আটকা আছে। এইবার —এই ফাঁকে—

তাড়াতাড়ি ছেঁড়া সতরঞ্চি পেতে তার উপর খানা পড়ল। কাজি সাহেব এদিক-ওদিক দেখেন, আর তীরগতিতে হাত চালান। সাধু এসে

ইসারা করল, ইয়াসিন বাটি ও প্লেটের উপর খবরের কাগজ মুড়ে এগিয়ে দিল। কাজি সাহেব বলেন, কে রে ওটা? বলে-টলে দেবে না তো?

বলবে কি, ও যে আমাদের সাধুচরণ। তারপর হেসে হেসে ইয়াসিন বলতে লাগল, সাধু কি বলে জানেন কাজি সাহেব, পাঁচ সিকে দেবে—চাট্টিখানি ভাত আর একছিটে নিরমিষ তরকারি।

মুখের গ্রাসটা গিলে নিয়ে কাজি সাহেব বললেন, পয়সাকড়ি আগাম নিও, ওদের বিশ্বেস নেই।

ইয়াসিন বলল, সে জানি। ভিনজাতকে ইয়াসিন মিঞা ছেড়ে কথা কয় না।

কেন কইবে? এক ঢোক জল খেয়ে কাজি সাহেব গলা সাফ করে নিলেন। বললেন, বেড়ে রান্না তোমার মিঞা। কেন গোলামি করছ এদের? এরা খায় আর নাক সিঁটকায়। আমার বাড়ি চাকরি করবে?

ইয়াসিন বলল, কাজি সাহেব, ঈদ হয়ে গেল—কিছু বখশিস পাব না?

কাজি সাহেবের মুখ আঁধার হল। খাওয়া প্রায় সমাধা হয়ে এসেছে। বললেন, বল কি ইয়াসিন—যাচ্ছেতাই এই এক মুঠো খাওয়ালে…তার আবার দাম দিতে হবে! আমার বাড়ি রোজ জাতভায়ের কত পাতা পড়ে জান? পঞ্চাশখানার কম নয়। আমি তাতে ফতুর হয়ে গেলাম নাকি?

অপ্রতিভ হয়ে ইয়াসিন না-না—করতে লাগল। বলল, আমার ইসমাইল এসে বসে আছে কিনা…এই পাঁচ-সাতটা বাঁকের পরে কুড়ুলমারির ঘাট—সেইখানে।…না-না—সে সব কিছু নয় কাজি সাহেব—আমার ছেলেকে আপনি শুধু ছাঁচ-পুতুল কিনে খেতে গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দিয়ে যাবেন।

অকস্মাৎ বিষম চেঁচামেচি—গালাগালির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সাধুচরণ ছুটতে ছুটতে এল, রজনীকান্ত এঁটোমুখে তাকে তাড়া করে আসছেন। সাধুচরণ বলছে, ওরে পাজি ইয়াসিন, ডিম দিয়ে তোর নিরমিষ তরকারি! তা-ও

আবার মুরগির ডিম। আমি ভাবছি, ঝোলের মধ্যে আলু ডুবে রয়েছে—

ওয়াক্-ওয়াক্-থু-থু-থুঃ—

রজনীকান্ত কি করবেন, ভেবে পান না। গণ্ডগোল শুনে হৈ-হৈ করে স্টিমারের যত মানুষ ভেঙে পড়ল। নাচের মজলিস ভেঙেছে—বারিধি-নন্দা ছুটেছে—কাজি সাহেবের পঙ্গপালের দল অবধি।

নন্দা একেবারে বোমার মতো ফেটে পড়ল। কুড়ি ডজন ডিম নিয়ে যাচ্ছি—তুমি তার মচ্ছব লাগিয়েছ উল্লুক? বারিধি বেশি কথার লোক নয়। বলল, এক্ষুণি, এই মুহূর্তে ডিসমিস করছি। মাইনের হিসাবে যা পাওনা—

কথা লুফে নিয়ে নন্দা বলল, পাওনা কি—পাঁচ টাকা ফাইন।

কাজি সাহেব এতক্ষণে সামলে নিয়েছেন। উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন, শুধু ফাইন কি—জুতো···জুতো। শুয়রের জিনিষ-পত্তোর নিয়ে এই সব হচ্ছে, তা কে জানে? আমায় বল্লে কি শয়তান, নিজের খানা দিয়ে দিচ্ছি। দাম আগাম বুঝে নিয়েছে শুয়র। রজনীকান্ত বুক চাপড়াচ্ছেন, জাত গেল, কুল গেল, ওয়াক্—ওয়াক্। যে যা খুশি মন্তব্য করছে। কেউ বলে, পুলিশে দাও; কেউ বলে, ধাক্কা মেরে ফেলে দাও জলে। এগিয়ে এসে একজন ইয়াসিনের চুলের ঝুঁটি ধরে বসল।

এত কাণ্ডের মধ্যে ইয়াসিন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, দুই টাকা পাওনা হুজুর—ছেলে আমার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। চাবুক মারুন, ফাইন করবেন না।

চাবুক নয়, জুতো···জুতো—এমন শয়তানের আগা-পাস্তলা জুতোতে হয়। রাগের বশে কাজি সাহেব সত্যই একপাটি জুতো ছুঁড়ে মারলেন। এই ব্যাপারে তিনি যে সকলের চেয়ে বেশি মর্মাহত, তাতে সন্দেহমাত্র রইল না।

শীতের ঘোলাটে জ্যোৎস্না আরও ম্লান হয়ে এসেছে। জোয়ার আসছে;

এতক্ষণে জল থমথমে হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণ্ডগোলে নন্দার মাথা ধরেছিল। ডেকের উপর খোলা হাওয়ায় বসে বসে কাজি সাহেব শেষে তাস বের করে আনলেন। রজনীকান্ত বারিধি আর নন্দাকে নিয়ে অনেকক্ষণ অবধি তাস চলল। তাঁদের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেছে। খেলা ভেঙে এবারে সব শুতে আসছেন। রজনীকান্ত হাঁকলেন, কে?

আমি হুজুর, আমি ইয়াসিন। সেই পয়সা ক'টার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

ভ্রূকুঞ্চিত করে রজনীকান্ত বললেন, পয়সা কিসের?

সেই পাঁচসিকের পয়সা হুজুর। ফাইন করে সব কেটে নিল, কিছুই তো দিল না। ছেলে আমার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে।

রজনী বললেন, বেয়াদব, জাত মেরেছিস, আবার—থু-থু-থুঃ—

আরও কাতর হয়ে ইয়াসিন বলল, কসুর হয়েছে হুজুর। মুখ্যু মানুষ—সমঝে দেয় নি। আণ্ডা তো নিরামিষ বলে জানা ছিল—

ইয়াসিনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে রজনীকান্ত কেবিনের দরজা এঁটে দিলেন।

তাসে হেরে কাজি সাহেব উন্মনা আছেন। একটু ঘোর-পেঁচ করে খেললে অব্যর্থ জিতে যেতেন। দাড়িতে হাত বুলিয়ে এই সব ভাবতে ভাবতে তিনি আসছিলেন, ইয়াসিন পায়ের গোড়ায় একেবারে হাঁটু গেড়ে পড়ল। সাহেব, ছেলে আমার এত রাত না খেয়ে ঘাটে পড়ে আছে। শুধু হাতে গেলে ওর ভাবী ওকে বাড়ি ঢুকতে দেবে না। আট আনা না হয় চার গণ্ডা পয়সা দিন সাহেব—

কাজি সাহেব রুখে উঠলেন, শয়তান, কি বেকুবটা করলি আমায়। দরকারে-বেদরকারে যেতে হয় স্যরের কাছে,—আমার পজিসন রইল না।

গদি-আঁটা একখানা বেঞ্চির উপর কাজি সাহেব রাগ মুড়ি দিয়ে পড়লেন।

ইয়াসিনও একদিকে কাঠের মেজের উপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে চাঁদ দেখতে পাচ্ছে। জোয়ার এসেছে, কিন্তু অর্ধেক জোয়ারের আগে

স্টিমার ভাসবে না। কচি ছেলের কান্নার মতো নদীতে অস্ফুট ধ্বনি। জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে ইয়াসিন—যেন তার কড়াইয়ের রাঁধা মাংস লাফাচ্ছে···হাড়-মাংসের টুকরোগুলো জড় হয়ে আস্ত মুরগি হয়ে ডাকতে লেগেছে, ভোর হবার সময়কার ডাক। জাগো···ইয়াসিন মিঞা, জাগো—

বাঁশী!···চমৎকার বাঁশী তো···এত রাত্রে বাঁশী বাজায় কে? ইয়াসিন উঠল। টিপিটিপি এগিয়ে গিয়ে ম্লানায়মান জ্যোৎস্নায় দেখতে পেল, নন্দারা তখনো ঘুমোয় নি—নিষুপ্তির রাজ্যে মেয়েকে কোলের উপর বসিয়ে সে বাঁশী শেখাচ্ছে। ইয়াসিন মনে মনে বলে, হুঁ, আচ্ছা মা হয়েছ যা হোক! কান টেনে দিতে পার না মেয়েটার? ইয়াসিনের আড়বাঁশী তার বাপজান একদিন মাড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছিল। ইয়াসিনের ইচ্ছা করে, পৃথিবীর যেখানে যত বাঁশী আছে—তেমনি করে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ—ও-ও-ও—

স্টিমার ছাড়ে বুঝি এবার! সে রেলিং ধরে এঞ্জিন-ঘরের পাশে এসে দাঁড়াল। চাঁদ ডুবে গেছে। আলো জ্বলছে, এঞ্জিন-ঘরে তবু আবছা আঁধার। কল উন্মাদের মতো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাতুড়ি পিটে চলছে ···ঠনাঠন, ঠনাঠন, ঠনাঠন। পাশাপাশি আর কতকগুলো কল ফিস-ফিস করছে···তালে তালে নিশ্বাস বেরুচ্ছে—হিস্-হিস্-হিস্। আগুনের হল্কা উঠছে, রাক্ষস হা করছে এক-একবার। খালাসিগুলো ছায়ামূর্তির মতো কাজ করে বেড়াচ্ছে এঞ্জিনের অস্থি-সন্ধিতে, নির্বাক নিঃশব্দ প্রেতের দল।

এঞ্জিনের আওয়াজ ডুবিয়ে বাঁশী এক-একবার কানে আসে। ইয়াসিন বলে, হুঁ···ইদিক পানে এসো না বিবিঠাকরুন, বয়লারে দু-কোদাল কয়লা দিয়ে যাও—দেখি মুরোদ কেমন! হাত দু'খানা অমন ফর্সা থাকবে না তা হলে—

কাজি সাহেব! কাজি সাহেব!

ধড়মড় করে কাজি সাহেব উঠে বসলেন। ইয়াসিন বলল, চাকরির কথা বলেছিলেন, তা হলে আপনারই সঙ্গে নেমে পড়ব। দেখলেন তো কাণ্ড?

দেখলাম না? দেখে দেখে বুড়ো হয়ে গেলাম। কাজি সাহেব বলতে লাগলেন, আমি বাপু, বকাবকি করব—হাতে ধরে মারব, কিন্তু ফাইন করব না কোন দিন। বেশ তো—জাতভাই চাকরি চাচ্ছ, 'না' বলতে পারি নে, কিন্তু মাইনেপত্তোর আপাতত দিতে পারব না, পেটভাতা…বাড়তি হিসাবে নিচ্ছি কিনা, জাতভাই—ওদের মতো ফেলতে পারিনে তো!

আবার রাগ মুড়ি দিয়ে কাজি সাহেব বোধ করি জাতভাইয়েরই চিন্তায় মগ্ন হলেন।

চারিদিক একেবারে নিশুতি হয়ে গেল। তারপর ইয়াসিন করল কি—কেবিনের ছিটকিনি খুলে নন্দার বাঁশীটা চুরি করল, চুরি করল ডলির পাউডার-কেস। জরিদার টুপিটা কাজি সাহেব অতি সন্তর্পণে বগলে চেপে ঘুমুচ্ছিলেন, সেটাও ইয়াসিন চুপি-চুপি সরিয়ে নিল। পাউডার মাখল ইয়াসিন সমস্ত মুখে, মাথায় পরল জরিদার টুপি, হাতে বিলাতি বাঁশী, দড়ি বেয়ে সে স্টিমারের ছাতের উপর উঠল। কত কাল পরে বাঁশী মুখে দিল—দুই গাল ফুলিয়ে গলার শির ফুলিয়ে কত চেষ্টা করল, বাঁশী বাজল না। বাঁশী বগলে নিয়ে চটি পায়ে ফটফট করে গম্ভীর চালে ইয়াসিন মিঞা ছাতের উপর ঘুরে বেড়ায়। এক-একবার থেমে কান পেতে শোনে কেউ টের পেয়েছে কি না—

ভোঁ-ও-ও-ও—

এসেছে কুড্ডুলমারি। ঘাটের গোল-ঝাড় দুটো আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। টুপি, বাঁশী নদীর জলে ছুড়ে দিয়ে ভালমানুষ ইয়াসিন আবার দড়ি ধরে নেমে এল।

স্টিমারের আলো, লোকজনের চিৎকার, উঠা-নামা—কিন্তু ইসমাইলের হুঁস নেই। পরণের কাপড়ের খানিকটা গায়ে দিয়ে হোগলার গাদার উপর কুণ্ডলী হয়ে পড়ে আছে। ঘুমন্ত বালকের পিঠে পড়ল এক কিল।

কোন কামের নয় হারামজাদা, কেবল ঘুমোতে শিখেছে।

বিহ্বল ইসমাইল ঘুম-চোখে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

বাপজান ?

মুখে তামুকের গন্ধ কেন রে—তামুক খেয়েছিস ? ঠাস-ঠাস করে দুটো চড়। ফোড়ায় লেগে গিয়ে রক্ত পড়ছে, ইসমাইল আর্তনাদ করে উঠল। হেরিকেন নিয়ে গোপাল-মাস্টার ছুটে এলেন, আরও কেউ কেউ এল। ইয়াসিন ততক্ষণে আবার স্টিমারে উঠে পড়েছে।

জেগে আছ নাকি ও সাধু ভাই ?

সাধুচরণ ঘুমোয় নি। ইয়াসিনের জন্য খুব কষ্ট হয়েছে। সে-ও যদি ঝোলটা একটু দেখে দিত—ডিমটা তুলে ফেলে দিলেই তো আর কোন হাঙ্গামা হত না। উঠে বসে ঝাঁঝের সঙ্গে সাধু বলে উঠল, বড় যে জাত-জাত করিস ইয়াসিন মিঞা—জাতভাইটাও কি ছেড়ে কথা কইল, না ভিনজাত বলে তাস-খেলাটা কিছু কম জমল ? আর জাত-জাত করবি ?

দশের মধ্যে ইয়াসিন মিঞা সবার হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করেছিল। এখন সে ইয়াসিন নেই—ছেলে মেয়ে চাঙ্গা হয়ে এসেছে।

কেন করব না ? জাত কি নেই ? বলতে বলতে সে হেসে উঠল। বলল, তুই হারামজাদা যদি কারো ধামা ধরে বেড়াবি, খুন্তি দিয়ে তোর ভুঁড়ি ছিঁড়ে দেব। সিগারেট খাবি ?

সিগারেট খুঁজতে ফতুয়ার পকেট থেকে বেরুল মহাযত্নে মোড়ক-করা বিস্কুটের টুকরোগুলো। ফুঃ—ফুঃ—দু'হাতের তলায় পাকিয়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে সে বিস্কুট উড়িয়ে দিতে লাগল।

সাধুচরণ হাত বাড়িয়েই আছে।

কই রে?

বিস্কুট উড়িয়ে ধীরে সুস্থে ইয়াসিন বের করল সিগারেট-কেস। কেসের চেহারা দেখেই সাধু শিউরে উঠল।

চুরি করেছিস?

চুরি কিসের? কাজি সাহেবের বালিশের তলে ছিল, নিয়ে এলাম। বলতে বলতে সে বাঘের মত গর্জন করে উঠল।

ইয়াসিন মিঞা ভিনজাতেরে ছেড়ে কথা বলে না—আর জাতভাই ছাড়া কাউকে কিছু দেয় না। নে—হাঁ করে থাকিস নে। দেশলাই আছে?

বন্দে মাতরম্

গ্রামের সীমানায় বিল। এখন অগ্রহায়ণ মাস, জল-কাদা নেই, যত দূর তাকাও ধানবনে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে। গহর আলির দাওয়া থেকে বিল দেখা যায়। কিন্তু সে. আর ক'দিন বা! বড়-পুকুরের ধার দিয়ে সারবন্দি আমের চারা পুঁতেছে, এই এবারের বর্ষাতেও আট-দশটা পুঁতেছে—চারাগুলোর নধর সবুজ শ্রী, পাল্লা দিয়ে ডাল-পালা মেলছে, বছর কয়েকের মধ্যে সমস্ত জায়গা জুড়ে ওদিকটা অন্ধকার হয়ে যাবে।

ধান কাটা লেগেছে। দু'বেলাই কাজ হয়। যতক্ষণ নজরে কুলোয় গহর ক্ষেতে থাকে। উঠানে এসে দাঁড়াতেই পরী তামাক সেজে আনে। কাস্তে

ফেলে গহর তখন হুঁকা নিয়ে বসে। আরও খানিক পরে হাত-পা ধুয়ে ভাত খায়। পরী ততক্ষণ মাদুর বিছিয়ে রেখেছে। কিন্তু খেয়ে দেয়ে যে বিশ্রাম নেবে, তার উপায় আছে! মল বাজিয়ে বউ অমনি হাজির। বলে, একটা গীত গাও না, শুনি।

খঞ্জনি বাজে, গান আরম্ভ হয়। সখীসোনার বারমাসি—ঝিকরগাছার পুল-ভাঙার গান—মুগ্ধ শ্রোতাটি বসে বসে শোনে। ঝিরঝিরে বাতাসে আমচারাগুলো নড়ছে, বড়-পুকুরের জল জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে, শীতের আমেজ লাগছে। গহর আলি হঠাৎ যেন সম্বিৎ পেয়ে জেগে ওঠে। বলে, বউ, অনেক রাত হল। তোর এখনও খাওয়া হয় নি—আজ এই অবধি।

পরীর নেশা লেগে গেছে, উঠতে চায় না। মৃদু হেসে বলে, ক-ঘড়ি বাজল? বারোটা—চোদ্দটা?

তা বাজল বই কি। এখন তুই খেতে যা।

তাচ্ছিল্যের সুরে পরী বলে—বাজুকগে। যা বাজবার বেজে যাক, তারপর ধীরে সুস্থে খেতে বসব। তুমি আর একখানা ধর।

গহর গম্ভীর হয়ে এক মুহূর্ত কি ভাবে। তারপর বলে, এই শেষ কিন্তু। এর পর আর গাইতে নেই।

বলেই গেয়ে উঠল—

সুজলাং সুফলাং মাতরম্।

মাত্র তিনটি কথা, তার বেশি জানা নেই। বিশ্রী সুর, উচ্চারণ আরও বিশ্রী। পুণ্য-নাম দেশসেবক যাঁরা, গহরের গান শুনলে তাঁরা ক্ষেপে যেতেন—বলতেন, জাতীয়-সঙ্গীতের অপমান হচ্ছে। পরীও হেসে খুন। বলে, অং বং—কি রকম গীত হচ্ছে গো? ভাল দেখে কিছু গাও।

গহর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, হাসিস নে বউ, এ আমাদের মাটির গান। বাপজান বড়-পুকুর কেটে গিয়েছে, চাষীরা লাঙল ছেড়ে ঘাটে এসে বসে,

আঁজলা ভরে জল খায়—ঐ হল গিয়ে সুজলা। নতুন ধানে আমাদের বিল ঐ ভরে গেছে, এত যে আমগাছ লাগিয়েছি ওতেও কি রকম ফল ফলবে দেখিস; চাষীরা এখন শুধু জল খায়, তখন আম খাবে; এই সব কথা দিয়েই গান বেঁধেছে—সুফলা। তারপর গহর প্রশ্ন করল, আমার বীরু-ভাইকে দেখিস নি বউ, নাম শুনেছিস তো?

পরী নামটাও শোনে নি।

গহর বলল,শহরের ফাটকের মধ্যে এখন হয়তো সে ঘানি ঘুরিয়ে মরছে।

বলতে বলতে একটু উন্মনা হয়ে পড়ে। জেলের ভিতরকার ব্যাপার সম্বন্ধে ধারণা তার স্পষ্ট নয়। হয়তো বীরুকে তারা পেট ভরে খেতে দেয় না, এত যে লেখাপড়া শিখেছে তার কোন মর্যাদা দেয় না, হয়তো হাতে পায়ে শিকল বেঁধে রেখেছে। নিশ্বাস ফেলে গহর বলতে লাগল, বীরু-ভাই 'বন্দে মাতরম্' গাইত, আমি হাসতাম। একদিন সে মানে বুঝিয়ে দিল, আমার তাজ্জব লাগল। মাটিকে ওরা মা বলে জানে—গাছপালা, ধানবন, পুকুরের জল, বাড়ি-ঘর-দোর সমস্ত মিলে ওদের মা। সেই মাকে ওরা 'বন্দে মাতরম্' বলে ডাকে।

পরী জিজ্ঞাসা করল, অমন লোকের ফাটক হল?

গহর বলল, ঐ তো মজা। আমরা চাষীর ছেলে, মাটি মেখে দিন কাটে। আমার বীরু-ভাই ভদ্দর হলেও মাটির পরে দরদ আমাদের চেয়ে বেশি। সেই মানুষকে মাটি থেকে সরিয়ে ইটের পাঁচিলে আটকে রেখেছে।

গহর আলি চুপ করল। পরী রান্নাঘরে গিয়েছে। দূরের জ্যোৎস্না-মগ্ন বিলের দিকে চেয়ে চেয়ে গহর তার বীরু-ভাইয়ের কথা ভাবতে লাগল। চোখে জল এসে গেল। কেন মানুষের এ রকম দুর্বুদ্ধি হয়! চাকরি-বাকরি করবি, ঘর-আলো-করা বউ আসবে, মায়ের মুখে হাসি ফুটবে,

পায়ের উপর পা দিয়ে দিব্যি দিন কেটে যাবে! তা নয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকের দুঃখের কথা শুনে বেড়ানো, হেরিকেন জ্বেলে পাড়ার এখানে সেখানে সভা করা—

রান্নাঘরে শিকল টেনে দিয়ে পরী শুতে যাচ্ছিল। গহর বলল, কাল মা-ঠাকরুনকে দেখতে যাব। যাবি রে বউ? আমার বীরু-ভাইয়ের মা, দেখলে পুণ্যি হবে।

পরদিন মনে তাড়া রয়েছে, মা ঠাকরুনের ওখানে যেতে হবে,—দুপুর না হতেই গহর আলি ক্ষেত থেকে ফিরে এল। খাওয়া-দাওয়া সেরে পরীর হাত ধরে বলল, চল্।

চল্ বললেই অমনি যাওয়া যায় বুঝি! পরীর এখনো কত কি বাকি! কাঁসার মল সে তেঁতুল দিয়ে মাজতে বসল; কপালে কাচপোকার টিপ পরল; বিয়ের ঢাকাই শাড়িখানা ফেরতা দিয়ে পরে ঝুমঝুম করে সে আ'ল বেয়ে গহরের পিছনে পিছনে চলল।

মাগো!

গহর? বস বাবা, আসছি এক্ষুনি।

বয়স হয়েছে কিন্তু মা দুপুরে ঘুমোন না। কাঁথার ডালা নিয়ে বসেছিলেন, সূঁচ-সূতা সাবধান করে রেখে তিনি বাইরে এলেন। পরীকে দেখেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

ওকি, ওকি! গহর বাধা দিয়ে উঠল। ওকি করছ মা?

বিস্মিত হয়ে মা প্রশ্ন করলেন, কি বলছিস গহর? এ আমার মা-লক্ষ্মী নয়?

হ্যাঁ মা, এদ্দিন ছোট ছিল,—আজ দিন কুড়িক একে বাড়ি নিয়ে এসেছি।

মা চটে উঠলেন, তবে যে তুই হাঁ-হাঁ করে উঠলি? আমার মাকে একটু আদর করছিলাম, তাতে তোর হিংসে হচ্ছিল বুঝি! দেখ্ দিকি, ছেলে মানুষ—কি রকম জড়সড় হয়ে গেছে!

গহর আলি অপ্রতিভ হয়ে বলতে লাগল, মাগো, সে কথা নয়। আমরা হলাম মোছলমান, তোমরা বামুন। এই অবেলায় ছোঁয়াছুয়ি হলে—

মা বললেন, ওঃ! গহরের আমার বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে, এ খবর তো জানতাম না! হাঁরে, বামুন-মোছলমান তোরা কবে থেকে হলি? তুই আর বীরু পাঠশালা থেকে কালি-ঝুলি মেখে আসতিস, মুড়ির মোয়া কাড়াকাড়ি করে খেতিস, তখন তো এ সব ছিল না। মনে পড়ে, পেয়ারাগাছ থেকে পড়ে পা ভেঙে কাঁদতে কাঁদতে এলি—তার উপর আমি আবার আচ্ছা করে কান টেনে দিলাম। এখন হ'লে বোধ হয় বলতিস, দেখ, মোছলমানের উপর হিন্দুর অত্যাচারটা দেখ একবার!

এ কথার জবাবে গহর আলি একটুখানি মুখ টিপে হাসে। মনে মনে বলে, খুব মনে পড়ে মা, কান টেনে দিয়ে তারপর সমস্ত দুপুর কোলের মধ্যে রেখে হাঁটুতে মলম মালিশ করলে। সে সব দিন কি আর আসবে?

মা বলতে লাগলেন, আমার ছেলে যে এত দুঃখ সইছে, সে বুঝি মোছলমান বাদ দিয়ে কেবল বামুন-জাতের জন্যে?

এ কথায় গহরের চোখে জল এসে গেল। বলল, মাগো, দোষ হয়েছে —তোমার বীরুর মতো তো বিদ্যে শিখি নি; কথাবার্তা বলতে জানিনে। রাজপুত্র হয়ে কেন যে ওরা বনে যায় আমি বুঝতে পারি নে। কিন্তু মা এটা জানি—যে মাটির জন্যে ওরা মরছে সে হিন্দুর মাটি, মোছলমানেরও মাটি। ওরা মাটি দেখে, জাত দেখে না। তারপর জিজ্ঞাসা করল, বীরু-ভাই আসবে কবে মা?

মা বললেন, আসবে তো ভাদ্র মাসে। এসে আবার কদিন থাকে, তাই দেখ।

মা কিছুতে ছাড়লেন না, বললেন, গহর বাবা, ঐ দাওয়ার উপর পাতা পেতে তোরা দুই ভাই খেতিস, মনে আছে? কতদিন কেউ মা বলে ডাকে না, ছেলের পাতে ভাত বেড়ে কতদিন দিই নি! আজকে তোদের ছাড়ছি না, খেয়ে যেতে হবে। তোর বীরু ভাই নেই, তেমনই আমার মা-লক্ষ্মী রয়েছে। দুটো পাতাই পাতব আজও।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল, চাঁদ উঠল। মা নিজের হাতে কি কি রান্না করলেন, দুজনের জায়গা পাশাপাশি করে দিলেন। পরীর তো পুরুষ মানুষের সামনে খাওয়া অভ্যাস নেই, আড়ষ্ট হয়ে হাত কোলে করে বসে থাকে। মা বললেন, ও মেয়ে, খাচ্ছিস না কেন? রান্না খারাপ হয়েছে বুঝি! বুড়ো মানুষ—তোদের মতো কি পারি?

গহর তাড়া দিয়ে ওঠে, কেন খাচ্ছিস না? এ জিনিস বেশি জুটবে না—খেয়ে নে। যতদিন বাঁচবি, মুখে স্বাদ লেগে থাকবে।

আরও জ্যোৎস্না ফুটেছে, দিনের মতো স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। মা রাঙচিতের বেড়া অবধি এগিয়ে দিয়ে গেলেন। এবার আ'লপথে নয়, বাঁধের রাস্তা দিয়ে চলেছে। ওদিক থেকে একখানা গরুর গাড়ি আসছে, তারই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হচ্ছিল। খানিক পথ গিয়ে গহর কথা বলে উঠল, মা দেখলি বউ?

পরী জবাব দিল না। গহর বলতে লাগল, শোন্ আমার বীরু-ভাইয়ের গল্প। সভা ভেঙে সবাই তো হুড়মুড় করে পালাল। লাঠির পরে লাঠি পড়ছে। তেঁতুলগাছের উপর থেকে আমি চেঁচাচ্ছি—পালা ভাই, পালা। সে নড়ে না, চেঁচিয়ে বলে - বন্দে মাতরম্। তারপর থানার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

আর্তকণ্ঠে পরী বলে উঠল, আহা!

গহর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, আমরাই ব্যথা পাই, তার ওসব বালাই নেই। বুকের মধ্যে অত জোর কোত্থেকে আসে জানিস বউ? ঐ মা রয়েছে বলে। আমার মা যদি ছোট বয়সে না মরে যেত, আমি কি সেদিন ঐ রকম পালাতাম? বীরু-ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আমিও বলতাম—বন্দে মাতরম্।

তারপর গহর তার জানা সেই একটা মাত্র কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারম্বার গাইতে লাগল—

সুজলাং সুফলাং বন্দে মাতরম্—

পরীরও বুক ভরে উঠল। গানের মধ্যে কেবলই তার মায়ের কথা মনে হচ্ছে—কাল রাতে গহর যে মানে করেছিল, সে তার মনে ধরে না। স্নিগ্ধ সুগৌর একখানি মুখ, পরনে সাদা থান—নিরলঙ্কার, দু-চারটে চুল পেকেছে—মার তাতে অপরূপ শ্রী খুলেছে, বন্দে মাতরম্!

গরুর গাড়ি নিকটে এসে পড়ল। গাড়ি থেকে হাঁক এল, হোই গো, যার ডাইনে সেই—

গলা শুনে গহর চিনতে পারল। মুন্সিসাহেব নাকি? নবাবপুরের মক্তবে যাওয়া হচ্ছে?

মুন্সিসাহেবও চিনলেন।—গীত গাচ্ছ, গহর মিঞা? তা একটা ভাল গীত গাইলে হয়—

গহর আলি লজ্জিত হয়ে বলল, গলাটা সুবিধের নয়। তা এই রকম মাঠে-ঘাটে গাই, মানুষ-জন দেখলে চুপ করি।

মুন্সিসাহেব বললেন, গলার কথা হচ্ছে না; ঐ গীতটাই যে ভাল নয়। ও হিঁদুর গান—মোছলমানের ছেলে গাইলে যে ধর্মে পতিত হবে।

গহর আলি অবাক হয়ে বলে, সে কি কথা মুন্সিসাহেব? মা কি কেবল হিঁদুর—মোছলমানের মা নেই?

মুন্সি স্নেহের হাসি হাসতে হাসতে বললেন, কোন্ মা সেটা ঠাহর করে দেখেছ মিঞা? ও যে হিঁদুর ঠাকুরের গান, দশহাতওয়ালা—

গাড়ি এগিয়ে গেল। গহর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়। বলে কি! বিশ্বাসী সরল মানুষ—যত কাজকর্মে থাকুক, পাঁচ বার নমাজ করতে কোন দিন ভুল হয় না তার। ধর্মের হানি হবে, তার চেয়ে জীবন যাওয়াই যে ভাল।

পরী তার হাত ধরে টানে। বলে, দুত্তোর, বাজে কথা!

সর্বনেশে কথা রে বউ! তারপর গহর চিৎকার করে বলে উঠল, মুন্সিসাহেব, আমি নবাবপুরে যাব একদিন। সব কথা আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

এরই প্রায় দিন-কুড়ি পরে, একদিন গঙ্গাচরণ সর্দার বেড়াতে এল। গঙ্গার বাড়ি খালের ওপার, বকডোবার আবাদে। ওরা এক গানের দল করেছে; গহর তাতে ঢোলক বাজাতে পারবে কিনা, জানতে এসেছে। গহর মহা উৎসাহে বলে, পারব, খুব পারব। কিন্তু ভাই, এই ক'টা মাস। বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে আর হবে না, লাঙল নিয়ে ভূঁয়ে নামতে হবে।

বকডোবার আবাদ জুড়ে এখন নোনা জলের তরঙ্গ খেলে। আগে ধান হত, এখন জলকর হয়েছে—দিন-ভোর মাছ ধরা হয়, শেষ রাতে ডিঙা বোঝাই হয়ে শহরে চালান যায়।

গঙ্গাচরণ এক নূতন খবর দিল। বলে, শোন নি বুঝি? সে গুড়ে বালি। লাঙল বেচে এবার খেপলা জাল কেনো গে যাও। তোমাদের বিলও ভাসিয়ে দেবে, শুনলাম। নীলমণি সাঁপুই সতর হাজার ডাক দিয়েছে। দেবে না? জলকরে লাভ কত!

এত বড় ভয়ানক কথাটা সহজে বিশ্বাস হয় না। গহর অর্থহীন ভাবে খানিক তাকিয়ে থাকে।

বল কি!

গঙ্গাচরণ হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, তাতে ঘাবড়াবার কি আছে মিঞা? সে তো ভাল কথা। রোদে পুড়ে সমস্ত দিন লাঙল ঠেলে বেড়াতে হবে না—রাত্তিরবেলা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাজ। কপালে লেগে গেল তো এক দণ্ডের মধ্যে পাঁচ সিকে দেড় টাকা রোজগার। তারপর দিন-মানটা ঘুমিয়ে তাড়ি খেয়ে যে রকম খুশি কাটিয়ে দাও।

গহর ব্যাকুলকণ্ঠে বলে, ছিলাম চাষা, শেষকালে কি চোর হতে হবে?

গঙ্গা বলে, কোন্ সুমুন্দি নয় শুনি? বলি, পেটে খেতে হবে তো! আর চোরই বল, যা-ই বল—আগের চেয়ে ভাল আছি ভাই। এখন পানে তাম্বুল-বিহার, সকালবেলা মিছরির জল—নানা রকম বেয়াড়া অভ্যেস হয়ে গেছে।

চেয়ারা দেখেই সুখের অবস্থা অনুমান করা যায় বটে! এদের বাপ-দাদা বকডোবার আবাদে একদিন সোনা ফলিয়ে গেছে; এদের কাজ গভীর রাত্রে। চারিদিক একেবারে নিশুতি হয়ে যায়, দূরের আলায় টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলে, সেই সময়ে আবছা আঁধারে বাগদিপাড়া থেকে একের পর এক প্রেতের মতো সব বেরিয়ে আসে। বাদার খোলে ঝুপঝাপ শব্দে জাল পড়ে, হয়তো আলা থেকে কোন পাহারাদার শুয়ে শুয়ে হাঁক দেয় —হোই গো—ও—ও! ছুটাছুটি করে এরা আবার পাড়ার গহ্বরে ঢুকে পড়ে; আর কোন সাড়া-শব্দ নেই।

গঙ্গাচরণের খবর মিথ্যা নয়, একদিন সকল প্রজার কাছারিতে ডাক পড়ল।

নায়েব বললেন, ভূঁয়ে কেউ লাঙ্গল দিও না বাছারা। নীলমণি সাঁপুয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

প্রজারা যেন হাহাকার করে উঠল, আমরা খাব কি হুজুর?

নায়েব বললেন, সে কথা বললে জমিদার শুনবে কেন বাবা? জমি তাঁর; তোমরা বছর বছর কেবল ঠিকা চাষ করে যাও বইতো নয়! এবারে সুবিধা হয়ে গেল, সাড়ে সাত হাজার টাকা বেশি মুনাফা —তার উপর টাকাটা একসঙ্গে এসে যাবে, কোন হাঙ্গাম-হুজ্জুত নেই।

জমিদার কেবল নিজেরটাই দেখলেন?

নায়েব শেষ করতে দিলেন না। বলতে লাগলেন, কেন, শুধু নিজেরটা দেখবেন কেন? তোমার ঐ নীলমণিও লাল হয়ে যাবে, এই বলে দিলাম। শহর যে রকম জেঁকে উঠছে, মাছের দরকার খুব— মাছের সেখানে সোনার দাম।

শহরের লোকে কি কেবল মাছই খায়? ভাত খায় না? ধান চালের তাদের দরকার নেই?

নায়েব বললেন, ধান তো কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক থেকে আসতে পারে। মাছ যে পচে যায়।

গহর আলি বলল, শহরের লোকের টাকা আছে, সোনার দামেও তারা কিনে খেতে পারে। আমরা যে ক্ষেতের তলানি খেয়ে বাঁচি। নায়েব মশায়, তোমরা নিজের আর নীলমণি সাঁপুয়ের দিকটাই দেখলে, ষাট ঘর চাষার দিকে চেয়ে দেখলে না।

খালের মুখের বাঁধ কেটে দিল। টুকরা টুকরা যত আ'ল ছিল, নোনা জলের ঢেউয়ে তাদের আর চিহ্ন রইল না। জ্যৈষ্ঠ মাসে গহরের দক্ষিণ ঘরের কানাচে দিন-রাত জলের ধাক্কা লাগে। বড়-পুকুরের কালো জল এরই মধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেছে। আগে পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর থেকেও লোকে নৌকা করে কলসি কলসি ভরে নিয়ে যেত; এখন পরীকেই বামুনপাড়া

থেকে জল নিয়ে আসতে হয়। সতেজ লাবণ্যভরা ধানগাছে যে সব জায়গা আঁটা থাকত, মাছের নৌকা সেখানে খটাখট বৈঠা চালিয়ে বেড়ায়। গহর আলি বিলের ধারে বসে বসে দেখে, যখন-তখন এসে চুপটি করে বসে থাকে।

পরী হাত দু'খানি ধরে বলে, তুমি অত কি ভাব বল তো?

যা ভাবি, সে মুখে বলবার নয়, বউ। বলতে বলতে গহর আলি গর্জন করে ওঠে। জানিস, তুই তখন আসিস নি,—এখানে পোড়ো জমি ছিল। নিজের হাতে কারকিত করেছি, জঙ্গল কেটেছি, ভুঁয়ে মাটি তুলেছি। আজ এক হুকুমে সেখানে নোনা জলের বন্যা বইয়ে দিল। এ সব কি চোখ মেলে দেখা যায়?

পরী বলল, দেখো না, চল যাই এখান থেকে। যদি আবার কখনও এসে পড়, চোখ বুজে থেক।

ইচ্ছে করে কি বউ, ওদের একটুখানি দেখিয়ে দিতে পারতাম!

বউ তাড়াতাড়ি গহরের মুখে হাত চাপা দিল। একটুখানি হেসে গহর বলল, দেখিস কি! আর ভাত জুটবে না, নোনা জল খেয়ে থাকতে হবে। আর এমনই কপাল, বীরু-ভাইও এ সময়টা বাইরে নেই। এত লোকের দুঃখ কখনও সে চুপ করে সইত না, উপায় একটা কিছু করতই।

যাই হোক, আপাতত অবশ্য কোন চিন্তা নেই—আলা বাঁধা হচ্ছে। এই উঁচু টিলাটা ছিল গহরের খামার-বাড়ি, এখানে সে ধান তুলত। এখন সমান চৌরস করে টোঙের মতো বড় বড় খড়ের ঘর উঠছে। মাটি কেটে চারি পাশে উঁচু বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, সকাল-সন্ধ্যা চাষীরা সব কোদাল নিয়ে বেরোয়। মাস দুই ধরে এই সব চলবে; সে ক'টা দিন এক রকম নিশ্চিন্ত।

সন্ধ্যার সময় মাটির মাপ হয়। কারকুন গোলাম হোসেন মাপকাঠি নিয়ে মাপ করে। পূর্ণ গায়েন থলি-ভর্তি পয়সা-সিকি-দুয়ানি নিয়ে বসে।

গোলাম হোসেন হাঁক দেয়, তিন—তিরিশ।

পূর্ণ বলে, তের পয়সা, নাও মিঞা—গুণে গেঁথে নাও।

গোলাম হাঁকে, চার—পুরো।

পূর্ণর সঙ্গে সঙ্গে হিসাব, সাড়ে চৌদ্দ পয়সা, ধর—

একুনে কার কত হল, রাস্তায় এসে সকলে হিসাব করতে করতে চলে। গহর আলি এত খাটে, তার চার কি পাঁচ আনার বেশি কোন দিন হয় না। অথচ আর সকলের কারও হয়েছে দশ আনা, কারও বারো আনা—এই রকম।

একদিন সে গোলামকে কথাটা বলল। গোলাম হি-হি করে হাসে। বলে, তুই বড্ড হ্যাকা গহর মিঞা। পয়সা কামাই করতে হলে ইয়ের বন্দোবস্ত করতে হয়। জুড়ন মাঝি কত পার্বণি দেয়, জানিস? সিকিতে আনা হিসাবে।

গহর বলে, বন্দোবস্ত হয় নি বলে আজ তিন হপ্তা ধরে এই রকম ফাঁকি দিয়ে আসছিস? মাটি মাপ্—আবার দেখব।

গোলাম হাসতে হাসতে বলে, খুব—খুব। একবার কেন—হাজার বার। মনে সন্দো রাখিস নে।

সে মাপ করতে লাগল, এই এক কাঠিতে হল ছ'ফুট, আর এক কাঠি হল বারো, আর এক কাঠি পনর, আর এক কাঠি—

মাপকাঠি গোলামের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গহর মারল তার চোয়ালে এক বাড়ি। আর্তনাদ করে গোলাম মাটিতে বসে পড়ল। বিশ-কুড়ি জন আলার দিক থেকে ছুটে এল, গহরকে এসে চেপে ধরল; কেউ ধরল হাত, কেউ কান, কেউ চুলের মুঠি…

প্রহরখানেক রাত্রে গহর ক্লান্ত দেহে বাড়ি এল। পরী কাঁদো-কাঁদো গলায় জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ?

কিছু না, তুই তামাক সাজ।

পরী বলল, হুঁ, সাজতে যাচ্ছি—বয়ে গেছে আমার! কাঁদতে কাঁদতে সে তেলের বাটি নিয়ে এল। পিঠের উপর মুখের উপর দড়ির মতো ফুলে ফুলে উঠেছে, পরী তেল মালিস করতে লাগিল। এক পশলা বৃষ্টির মতো ঝরঝর করে গহরের চোখ দিয়ে হঠাৎ জল নেমে এল। কি মনে হল—চোখের জলের মধ্যে অতি অস্পষ্ট কণ্ঠে বারম্বার সে বলতে লাগল, মা, মা, বন্দে মাতরম্—

গভীর রাতে গহর টিপিটিপি বেরুচ্ছে। পরীর সজাগ ঘুম, সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাও গো ?

গহর ফিসফিস করে বলে, বকডোবার আবাদে, একটা খেপলা জালের খোঁজে গো। আজ ওরা পিঠেই দিয়েছে, পেটের তো কিছু দেয় নি। কাল যে নিরম্বু উপোস, তা ঠাহর করছিস ?

বাগদিপাড়ায় গিয়ে গহর প্রথমেই গঙ্গাচরণের দাওয়ায় উঠল।

গঙ্গাচরণ শুনে লাফিয়ে উঠল, বল কি, মিএগ ? আট ঝুড়ি মাছ মজুত রয়েছে, আর বেটারা পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে ? পেটে জুত থাকলে ঘুম আসে ঐ রকম! চল—চল, খাসা হবে—আমাদের যাত্রাদলের সাজের টাকাটা হয়ে যাবে এইবার।

খাল পেরিয়ে ছায়ামূর্তিরা চলেছে টিপিটিপি। অন্ধকার রাত্রি, কোন দিকে কেউ নেই। আলার উপর তীব্র একটা আলো জ্বলছে, অনেক দূর থেকে দেখা যায়। বাগদিরা বিলের খোলে নেমে দাঁড়াল। মাছের ঝুড়ি রয়েছে বটে! কিন্তু সকলেই যে ঘুমিয়ে আছে তা নয়, ঝুড়িগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে জন দুই লোক পাহারা দিচ্ছে।

গহর ফিসফিস করে বলল, দেশলাই আছে রে?

গঙ্গা বলল, উঁহু, এখন কি বিড়ি ধরাবার সময়?

গহর বলল, বিড়ি নয় রে, আলায় আগুন ধরালে কেমন হয়? ঐ জায়গাটায় আমি ধান তুলতাম এখন ওরা ঘর তুলেছে।

যুক্তিটা সকলে অনুমোদন করল। সবাই আগুন নেভাতে ব্যস্ত থাকবে, মাছ নিয়ে সেই ফাঁকে সরে পড়বার সুবিধা হবে।

দাউ-দাউ করে আলা জ্বলে উঠল। ঐ অত রাত্রে বিলের মধ্যে তখনও মাছ ধরা হচ্ছিল। আগুন দেখে আর চিৎকার শুনে যে যেখানে পারল নৌকা রেখে বাঁধ ধরে ছুটল। নূতন জলকর হয়েছে, চাষীরা সব ক্ষেপে আছে, কখন কি করে বলা যায় না,—জেলেদের সকলের সঙ্গে তাই সড়কি রাখবার হুকুম আছে। সকালবেলা শোনা গেল, আলায় মাছ লুঠ করতে এসেছিল, সুবিধা করতে পারে নি, তিন-চার জন ধরা পড়েছে, আর তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছে গহর মিঞা।

সেই রাত্রেই গহরকে শহরের হাঁসপাতালে পাঠান হল। সেখান থেকে আদালতে। একদিন হাজতের মধ্যে চুপিচুপি সে পরীকে বলল, তোর জন্য ভাবি নে বউ,—ইচ্ছে হয় বাপের বাড়ি যাস, না হয় মা-ঠাকরুনের ওখানে গিয়ে থাকিস। বীরু-ভাই ভাদ্র মাসে বেরিয়ে আসছে, তবে আর কি! কিন্তু আমার দুঃখ, সমস্ত কথা শুনে ভাই আমার বলবে কি! চোর-ডাকাতকে ওরা ঘেন্না করে। ওরা ফাটকে যায় ফুলের মালা পরে, আর আমি চললাম ডাকাতি করে। এখন সেখানে দেখা না হলে বাঁচি। কি করে তার মুখের দিকে তাকাব!

গহর আলির দু-বছর জেল হয়ে গেল।

বছর-দুই পরে এক সকালে বীরনারায়ণ জেলের গেটের ধারে দাঁড়িয়ে

আছে। গহর বেরিয়ে এল। বীরু বলে, আমায় চিনতে পার গহর-ভাই ?

পারি বই কি ভাই ? এত বড় হয়েও আমাদের সকলের জন্য তোমার কত দুঃখ ! চিনব না ? বন্দে মাতরম্—

বীরু প্রতিধ্বনি করল, বন্দে মাতরম্।

আরও জন-কয়েক লোক সেখানে ছিল, নানা দরকারে তারা জেলের গেটে এসে এসে দাঁড়িয়েছে। তারাও হেঁকে উঠল, বন্দে মাতরম্।

রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যায়। একজন বলে, কোন্—স্বদেশি বাবু বেরুল বুঝি ? থাম, একটুখানি দেখে যাই।

তাদেরই পাশ দিয়ে গহরের হাত ধরে বীরনারায়ণ গরুর গাড়ির দিকে যাচ্ছিল। বলল, হ্যাঁ ভাই, বড় স্বদেশী আমাদের গহর আলি। কিন্তু বাবু নয়—স্বদেশি মজুর। দু-বছর পরে এই বেরুচ্ছে। বল ভাই, বন্দে মাতরম্।

গরুর গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ করে অসমান মেঠো পথে চলেছে। গহর ছলছল চোখে বলল—মিছে কথা কেন বললে, বীরু-ভাই ?

বীরু বলল, কোন্‌টা মিছে ?

এই যেমন আমি স্বদেশি করে ফাটক গিয়েছি। আমি তো ভাই, আলা লুঠ করেছিলাম।

বীরনারায়ণ বলল, ও তো একটা ছুতো। আসলে, তোমার প্রাণ কাঁদছিল। সুজলা সুফলা আমাদের গাঁয়ের ঐ দশা তুমি দেখতে পারছিলে না। বড়-পুকুরে নোনা জল উঠেছে, ধানবন খাঁ-খাঁ করছে, একি তোমার সহ্য হয় ? আলা লুঠ করে, যা হোক করে, তোমার প্রাণ কোথাও আড়ালে গিয়ে জিরোতে চাচ্ছিল, আমি কি বুঝি নে ভাই ?

একটুখানি চুপ করে থেকে গহর বলল, কিন্তু এ তো একেবারে আমাদের নিজেদের ব্যাপার। এতে কি স্বদেশি হল?

বীরু বলল, স্বদেশ কি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে? দেশের মানুষ দাবি বুঝে নিতে পারে না বলেই ত দু-চার জনের কাঁধে বোঝাটা বেশি হয়ে চাপে।

পাশাপাশি তারা চুপ করে রইল। গাড়ি খালের ধারে ধারে চলেছে। গহর হঠাৎ বীরুর হাত দু-খানা জড়িয়ে ধরল। বলল, গাঁয়ে তো ফিরছি, একটা কথা বল, ভাই—এ দ্দিনে আপদ চুকে গেছে তো? নীলমণি সাঁপুই বিদায় হয়েছে? আবার ধান হচ্ছে? ছেলেমেয়েরা বড়-পুকুরে চান করতে আসে তেমনি করে? আমার আম-চারায় এবার আম হয়েছিল? তুমি যখন ফিরে এসেছ, সমস্ত আবার ঠিক হয়ে গেছে—নয়?

বীরনারায়ণ ম্লানদৃষ্টিতে গহরের চোখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইল। বলল, হয়ে গেছে বই কি ভাই! তুমি ভেব না, সব ঠিক আছে।

গরুর গাড়ি বাড়ির সামনে আসতেই অনেকে এসে দাঁড়াল। ভিড় সরিয়ে বীরু হাত ধরে তাকে দাওয়ায় নিয়ে বসাল। গহর ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে, বীরু-ভাই, মা এসেছেন তো? তারপর জোর গলায় হাঁক দেয়, ও মা, মাগো, দুটো মুড়ি দেবে না? কতদিন খাই নি তোমার হাতে! আমার বীরু-ভাই আছে—দু-জনে কাড়াকাড়ি করে খাব।

মৃদু পায়ে পরী এসে দাঁড়াল। যত পালিয়ে আসুক, গহর তা টের পায়। হাসতে হাসতে বলল, কেমন আছিস বউ?

পরীর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। কথা বলতে পারে না—ভয় হয়, বুঝি বা কেঁদে ফেলবে। তারপর বলল, তুমি কেমন ছিলে গো?

—ভাল। তবে কষ্ট হত খুব—চারিদিকে ইট আর ইট! আহা-হা, আজ চোখ জুড়োচ্ছে। আমরা হলাম চাষার ছেলে, ধানবন না দেখলে বাঁচি?

পরী চমকে উঠল। ও কি পাগল হয়ে গেছে? বলল, কি দেখছ?

ধানবন। কি রকম মিশ্‌কালো হয়েছে, দেখ্‌! কত গাছপালা! আমার আমচারাগুলো কত বড় হয়েছে রে? এবার আম হয়েছিল?

পরী ভাল করে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। অর্থহীন লক্ষ্যহীন দৃষ্টি। তার ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হল। হায় রে, নোনা জলের তুফান লেগে গহরের নিজের হাতে পোঁতা আমচারাগুলো যে কোন্‌ কালে মরে গেছে!

গহর বলল কি ভাবিস রে বউ? আমার কথার জবাব দিলি নে?

পরী ধরা গলায় বলল, অনেক আম হয়েছিল, আমসত্ত্ব করে রেখেছি—তুমি খেয়ো।

আর, বড়-পুকুরের জল মিঠে হয়েছে তো রে? খেতে নোনা লাগে না? আমার জন্যে এক ঘটি নিয়ে আয় দিকি!

আচ্ছা—বলে বউ ছুটে পালাল।

গহর তখন বলছে, ও বউ, বলি সেই গীতটা মনে আছে—সুজলাং সুফলাং বন্দে মাতরম্‌? এখন ভাল লাগে? তার মানে বুঝিস?

পরী তখন ও-ঘরের মেজেয় পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। মার কাছে গিয়ে বলে, মাগো, ও অন্ধ হয়ে গেছে।

মা বললেন, সে তো অনেক আগেই শুনেছি মা। তাই শুনে বীরু ওকে জেলে দেখতে গিয়েছিল। তুই দুঃখ পাবি বলে তোকে জানায় নি। সেই যে সড়কির খোঁচা লেগেছিল, তারপর ক্রমেই খারাপ হয়ে গেল।

কাঁদিস না বেটি, ও এই বাড়ি-ঘরদোর বড় ভালবাসত কিনা, তাই তাদের এ দশা ভগবান ওকে আর দেখতে দিলেন না।

বীরু বলল, মা, অন্ধ হয়ে গেছে গহর-ভাই, কিন্তু ও দেখতে পাচ্ছে। ও দেখছে—বড়-পুকুরে কাকের চোখের মতো জল, বিল-ভরা সবুজ ধান, গাছে গাছে ফুল, মানুষের মুখে চোখে হাসি, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা আমাদের মা। আমাদের চেয়ে ও ভালই দেখছে। আসতে আসতে গহর গাড়িতে সেই সব কত গল্প করল! মাগো, ভাগ্যবান আমার গহর-ভাই—আমরা সব মরে আছি যে, যদি বেঁচে থাকতাম সবাই ঐ রকম অন্ধ হতে চাইতাম।

বেলা পড়ে এল। কাজকর্মের পর বাড়ি ফিরবার মুখে অনেকে গহরের উঠানে এসে বসেছে। নবাবপুরের মুন্সিসাহেব গহরকে খুব ভালবাসতেন, খবর পেয়ে তিনিও এসেছেন। আসতেই তর্ক শুরু হয়েছে। তিনি বলছেন, বেশ তো, বন্দে মাতরম্ বললে আমরা যখন চটে যাচ্ছি—জেদাজেদির কি দরকার? আর একটা নতুন কিছু গাইলেই তো হয়! অবশ্য দেবতা-টেবতা সব বাজে—দশভুজাকে কখন সুজলা বলে না, সে সবাই বোঝে। কিন্তু আর কিছু না হোক—এই গান যিনি লিখেছেন, আমাদের জাতকে তিনি গালি দিয়েছেন, এটা তো মানতে হবে!

বীরনারায়ণ উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না—

শান্তকণ্ঠে মা বললেন, সে তর্কের দরকার কি বাবা? আমরা তো কেউ বঙ্কিমের বন্দে মাতরম্ গাই না।

বঙ্কিমের গান নয় ?

মা বলতে লাগলেন, না, মুন্সিসাহেব। আনন্দমঠের সন্তানেরা বইয়ের পাতায় আছে, আমার এই সন্তানেরা রক্তে মাংসে চোখের সামনে বেড়াচ্ছে। এদের গান ভেঙবার জো নেই। এই বন্দে মাতরম্ আমার বীরুর রক্তে রাঙা হয়ে রয়েছে, এই গান আমার অন্ধ গহরের চোখের জলে ভিজে গেছে। সত্যি যদি গানের জন্মগত দোষ কিছু থাকে, চোখের জলে ধুয়ে ধুয়ে তাতে আর এক কণিকাও ময়লা নেই। আর একটা নতুন কিছু গাইবার প্রস্তাব করছিলেন, তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবে কে ? রাজি আছেন আপনারা ?

গহর রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠল—তুমি বলবে বই কি, মুন্সিসাহেব ! তুমি থাক নবাবপুরে—সেখানে ধানবনে নোনা জলের তুফান বয় না, চোখ মেলে উঠানের উপর মরা আম-চারাও দেখতে হয় না। তোমরা সুখের মানুষ—মাকে চিনবে কি করে ! তুমি বাড়ি যাও মুন্সিসাহেব, আমরা এখন বন্দে মাতরম্ গাইব।

সুরহীন কণ্ঠে বন্দে মাতরমের একটি কলি গাইতে গাইতে গহর আলির চোখ ভরে গেল।

এরোপ্লেন

ঠিক দুপুরে আকাশে আওয়াজ উঠল—বোঁ-ও-ও-ং

নিতু এই দরজার সামনে বসে আঁক কসছিল। মাথা তুলে নীলিমা দেখল, সে নেই—পালিয়েছে। বাইরে এসে ডাকতে লাগল, যেও না—যেও না খোকা, ফিরে এস। নইলে দেখতে পাবে কিন্তু—

কে কার কথা শোনে! ছেলের দল তখন মাঠে গিয়ে উঠেছে; মহা ব্যস্তভাবে ঘুড়ির সূতা ছাড়ছে। কাণ্ড দেখে রাগ থাকে না, হাসি পায়। পাগল ছেলে, বোকা ছেলে সমস্ত!

গাঁয়ের উপর দিয়ে ইদানীং প্রায়ই এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে—সপ্তাহে এমন দু-তিনবার দেখা যায়। কোথায় যায় তার সঠিক খবর এরোপ্লেন-ওয়ালারাই বলতে পারে; কিন্তু নানা-জনে নানা-কথা বলে। কোন্ অঞ্চলে নাকি খুব বড় যুদ্ধ বাধবে, নানা জায়গায় ঘাঁটি হচ্ছে, সাহেবেরা এরোপ্লেনে চড়ে সেই সব জায়গায় ছুটোছুটি করে। এদিকে পাড়ার ছেলেরা মিলে আচ্ছা এক বুদ্ধি করেছে—প্রকাণ্ড ঢাউশ ঘুড়ি বানিয়েছে, শনের দড়িতে মাজন দিয়ে খুব শক্ত করেছে। আকাশে আওয়াজ উঠলেই তারা ঘুড়ি উড়িয়ে দেয়, হরদম সূতা ছাড়ে, কোন গতিকে একবার দড়িতে জড়িয়ে ফেলতে পারলে এরোপ্লেন তারা টেনে ভূঁয়ে নামিয়ে ফেলবে। কিন্তু ফাঁদের তোড়জোড় করতে করতেই এরোপ্লেন উড়ে বেরিয়ে যায়; দূরে গিয়ে যেন ব্যঙ্গ করতে থাকে—বোঁ-ও-ও-ও—

মাঘের শেষ। শুকনো মাঠ খাঁ-খাঁ করছে। রাস্তার ধারে ঝুপসি ঝুপসি চার-পাঁচটা বটগাছ। এরোপ্লেন বটগাছের উপর দিয়ে, মজা-

দীঘির উপর দিয়ে, খেজুরবনের উপর দিয়ে, গাঙের ওপারে চলে গেল—একটা চিলের মতো—একটা চড়ুয়ের মতো—আকাশের গায়ে একটা কালো ফোঁটার মতো—তারপর আর কিছুই দেখা যায় না। হাতের নাটাই মাটিতে ছুড়ে ফেলে রাগ করে নিতু বলে উঠল, নাঃ, মজা হল না—ওরা টের পেয়ে গেছে—

কিন্তু আর এক মজা ইতিমধ্যে পায়ে হেঁটে এসেছে—এক চীনা সাহেব। লোকটা আধ-পাগলা। আরও ক'দিন এদিকে এসেছে। আকাশ-মুখো তাকিয়ে সে থুতু ফেলছিল—থুঃ থুঃ। তারপর এরোপ্লেন চলে গেলে দীঘির ঘাটে নেমে জল খেতে লাগল। এখান থেকে ক্রোশ পাঁচ-ছয় দূরে রাধাগ্রাম—খুব নাম-করা গঞ্জ। চীনাদের আড্ডা সেইখানে। সকালবেলা বোঝা কাঁধে নিয়ে আশেপাশের গ্রামে তারা সিল্ক বেচতে বেরোয়, সন্ধ্যায় বাসায় ফেরে।

সাহেব অঞ্জলি ভরে জল খাচ্ছিল। মদন বলল, ও সাহেব, শুধু জল খাচ্ছ কেন? পাড়ায় চল—জলখাবারের জোগাড় আছে—এককুড়ি আরশুলা ধরে রেখেছি।

সাহেব মুখ নেড়ে বলে, হুঁ যাবে। খর-রৌদ্রে মাঠ ভেঙে এসেছে, মুখে যেন রক্ত মেখে গেছে। চেহারা দেখে ছেলের দল দূরে গিয়ে দাঁড়ায়।

সাহেব পাড়ার মধ্যে ঢুকল।

সি-লিক—লিবে সি—লিক?

এক বাড়ির উঠানে বোঝা নামিয়েছে। লিবে এটা? বহুৎ খাসা চোস্ত আছে—

বউ-ঝিরা ভিড় জমিয়েছে।

নীলিমা সিন্ধ তেমন দেখছে না, সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে মনটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠল। আহা! কত দূরে বাড়ি, কত সমুদ্র-পাহাড়-পর্বতের ওপার, বয়সই বা কি এমন! ছেলে-মানুষ—আপনার জন কাছে নেই। বলল, খাওয়া হয় নি বুঝি সাহেব?

সাহেব হেসে ফেলে। পেটের উপর হাত রেখে বলে, হাঁ—ভুখ আছে।

চাট্টি চিঁড়ে খাবে?

ছেলেরা এখানেও জুটেছে। তারা বলতে লাগল, আরশুলা খাবে? ইঁদুর খাবে? ব্যাঙ খাবে?

ন-গিন্নি মুখ বাঁকিয়ে বললেন, ওমা কি ঘেন্না! সত্যি সত্যি ব্যাঙ খায়? কি রকম মেলেচ্ছ!

চীনা সাহেবের হাঁকাহাঁকিতে আলোচনা বেশি এগুতে পায় না।

কি কি লিবে তুমরা—বোলো—

কত পড়বে ঐ চাদরটা?

ছ লুপেয়া। বহুৎ খাসা আছে—

হুঁ, ছ-টাকা না হাতী। পাতলা ফিন-ফিন করছে। আট আনায় হবে সাহেব?

সাহেব বিষম রেগে গেল। জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করতে করতে বোঁচকা বাঁধে। এমনি সময় কোথা থেকে ঝুপ করে পড়ল এক কোলা-ব্যাঙ। ডোবা থেকে সদ্য ধরে আনা হয়েছে, আষ্টেপিষ্টে কাদা-মাখা। সমস্ত জল-কাদা সাহেবের সেই বহুৎ-খাসা চাদরে মাখামাখি হয়ে গেল। হি-হি হো-হো হাসির তুবড়ি ফুটছে। সাহেব ক্রুদ্ধ চোখে একবার চেয়ে জামার আস্তিন দিয়ে কাদা মুছতে লাগল। নীলিমা বলল, দেখছেন ন-মা—অত্যাচারটা দেখুন একবার। আপনাদের মদনাই সর্দার। ওকি—ওকি—

সাহেব হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তীরবেগে ছুটল। ছেলেরাও ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। বোধনতলায় চাটুজ্জেরা খোয়া ভাঙিয়ে গাদা করে রেখেছেন, সাহেব সেখানে গিয়ে আথাড়ি-পাথাড়ি খোয়া ছুড়তে লাগল। একটা লাগল নিতুর চোয়ালে। বাবা গো—আর্ত চিৎকার করে সে মাটিতে পড়ে গেল। নীলিমা ছুটল, মেয়ে-পুরুষ যে যেখানে ছিল ছুটে এল।…এমনি সময়ে মাথার উপরে বোঁ-ও-ও-ও—। সেই এরোপ্লেন আবার এসেছে, উপরে এসে পাক দিচ্ছে…অত্যন্ত নিচু হয়ে এসেছে, অবাক কাণ্ড! বোধন-গাছটার বেশি উঁচুতে নয়। চীনা সাহেব উপর দিকে চায়, তারপর প্রাণপণে দেয় দৌড়। সিল্কের বোঝা পড়ে রইল, আমবাগান কলাবাগানের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে নালায় গিয়ে পড়ে গেল। ধর্—ধর্—

নিতুর বাপ মণিলাল কলিকাতায় খবরের কাগজের অফিসে কাজ করে। এই দুপুরে খটাখট চলেছে টাইপ-রাইটার, অবিশ্রান্ত চলেছে। একধারে কাঠের পার্টিশন দেওয়া পাঁচ-সাতটা কামরা—এডিটরেরা সেখানে বসেন। মুহুর্মুহু কলিং-বেলের শব্দ…উর্দিপরা চাপরাশিরা নিঃশব্দে আনাগোনা করছে।

রক্ষিত মশায় এসে ঢুকলেন। রুমাল বের করে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, বাপ রে বাপ, শীত একদম নেই—এরই মধ্যে আগুন ঢালছে; বাঁচতে দেবে না।

পূর্ণ প্রুফের স্তূপের মধ্যে নিমগ্ন ছিল। মুখ তুলে বলল—ঠিক বলেছেন। বাঁচতে দেবে না। এই দেখুন, আজকে সাত হাজার। এদিকেও এল বলে।

মণিলাল কোণ থেকে বললে, কি হয়েছে, পূর্ণবাবু?

পূর্ণ বলল, সাংহাইয়ের খবর। সাত হাজার মরেছে। পোকার মতো পুড়িয়ে মারছে।

মণিলাল সংক্ষেপে মন্তব্য করল, মরুক।

পূর্ণলাল সায় দিয়ে বলে, তা ঠিক। বড় বজ্জাত ঐ চীনেগুলো। তিন টাকার এই জুতো, আমার কাছে সাড়ে চার নিয়েছে। বেটারা জোচ্চোর।

মণিলাল বলে, খেতে পায় না, জোচ্চুরি করে। নিজের জিনিষ পাঁচ ভুতে লুঠে খায়—ঠেকাবার ক্ষমতা নেই। ওদের মরাই উচিত।

রক্ষিত বললেন, ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। এদিকেও আসছে ভায়া। তাইতো শলা-পরামর্শ আরম্ভ হয়ে গেছে। দেখ, গোলমালে এবার কর্তাদের দার্জিলিং যাওয়াই বা বন্ধ হয়!

এক ছোকরা মণিলালের টেবিলের সামনে অনেকক্ষণ ধরে কি সব বলছিল—এবারে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সোমবার আসব?

না।

মঙ্গলবার?

না।

তবে তার পরদিন, কি বলেন?

তার পরদিন না, তারও পরদিন না—কোন দিন না।

ছোকরা বেরিয়ে যেতে রক্ষিত বললেন, কে ওটি? রোজ আসে—বড় যে কুটুম্বিতে!

মৃদু হেসে মণিলাল বলল, রাগের বশে বড়-কুটুম্বই বলতে ইচ্ছে হয় রক্ষিত মশায়। সেই এগারোটায় এসে গুণের ফিরিস্তি দিতে বসে গেছে। বলে, এডিটার সাহেবকে বলে কয়ে একটা কিছু জুটিয়ে দাও।

পূর্ণ মুখ বাঁকিয়ে বলে, খবরদার খবরদার, অজ্ঞাতকুলশীলস্য—বুঝলে তো হে? বলে, নিজের পেটে হাঁটু পানি—সুমুন্দিরে ডেকে আনি—

মণিলাল বলল, জাপানি বোমা দুই-একটা এদের মাথায় পড়ে না? তা হলে আপদ চোকে।

রক্ষিত বললেন, ভায়া, বোমা পড়লে খবরের কাগজের আফিস বাদ দিয়ে পড়বে না, সেটা মনে রেখো। ওরা মরবে—আর তুমি যে রিপোর্ট দিয়ে স্পেশাল কাগজ বের করবে, অত বিবেচক জাপানিরা নয়—

তা হলে তো একটা সদ্গতি হয়ে যায়, রক্ষিত মশায়। ওরা বেকারের দল আমাদের হিংসা করে। তার মানে, ওরা মরছে অনাহারে পথের ধূলোয়—আর আমরা মরছি পাকাঘরের মধ্যে দিনের পর দিন এই টাইপ করতে করতে—

মণিলাল স্তব্ধ হয়ে যায়। অনেকদিন আগেকার বিস্মৃত স্বপ্ন এক মুহূর্ত তার মনের মধ্যে দোলা দিয়ে ওঠে। ১৩২৭ সন—যেবার সে কলেজ ছাড়ল। স্বাধীনতা আসছে—লোকের মুখে মুখে, আকাশে, বাতাসে সেই প্রত্যাশা—কয়েক মাসের মধ্যেই এসে পড়বে। নৌকা করে যাচ্ছ, দেখবে—এ গ্রামে সে গ্রামে গাঙের ধারে হেরিকেন জ্বেলে মিটিং হচ্ছে, মানুষ যেন পাগল হয়ে উঠেছে।···কিন্তু এসে তো পৌঁছল না! ১৩২৭ সনের সেই সঙ্কল্প-দৃঢ় দৃষ্টি দু'টি স্তিমিত হয়ে এল, অথচ এখনও আসবার দেরি রয়েছে···

কিড়িং, কিড়িং—দু-বার আওয়াজ। অর্থাৎ মণিলালকেই যেতে হবে নিউজ-এডিটারের ঘরে।

এডিটার বললেন, কি হয়েছে বলতো? আফিসে নেশা করে এস না-কি?

মণিলাল কাপিটা হাতে নিল।

পাঁচদিনকার পচা খবর প্রেসে দিয়েছ। ও তো ছাপা হয়ে গেছে।

মণিলাল বলল, আমার মনে ছিল না। মাপ করুন সার—

এডিটার নরম হয়ে বললেন, মন কোথায় থাকে ? তারপর একটু-খানি হেসে বললেন, ওঃ আজ বুঝি শনিবার। কিন্তু ছ'টার গাড়ির আশা ছেড়ে দাও। এই ছবিগুলোর হেড-লাইন ঠিক করে দিয়ে যাবে। আমি এখন যাচ্ছি—তুমি করে রেখে দেবে। সোমবার বারোটার মধ্যে চাই, বুঝলে ?

আজ্ঞে সার। মণিলাল ঘাড় নাড়ল।

মনে মনে বলে, বয়ে গেছে, আমিও যাচ্ছি। চব্বিশ ঘণ্টার কেনা গোলাম না কি ?

ছবির প্যাকেটটা পকেটে পুরে নিল। কাল রবিবার বাড়িতে বসে ও সমস্ত হবে।

রাত বেশি নয়, জ্যোৎস্না উঠবে আরও খানিক পরে, এখন আবছা অন্ধকার। বাড়ি পৌঁছুতে অনেক দেরি। নীলিমার ঘরে জানালার ধারে আলো জ্বলছে—প্রতি শনিবারেই আলোটা সে জানালার কাছে এনে রাখে। স্টেশনে পৌঁছবার পোয়াটাক পথ আগে লাইনের পাশেই গ্রাম। দীঘির ধারে বোধ করি হাজারখানেক তাল গাছ—তারই এদিকে-সেদিকে বসতি। গ্রামের পাশ দিয়ে যখন গাড়ি ছোটে, মণিলাল প্রতি শনিবারেই দেখতে পায়, তার জানালায় আলো জ্বলছে।

আলো জ্বলছে গাড়ির কামরার মধ্যে। ওধারের বেঞ্চিতে একদল তাস খেলছে। করিৎকর্মা লোক সময়ের অপব্যয় ধাতে সয় না। দুই বেঞ্চির মাঝের ফাঁকে চাদর বেঁধে নিয়েছে, তারই উপর খেলা চলছে। মণিলাল ভাবছে, এই অন্ধকার রাত্রে দূর-দূরান্তের এক অদেখা দেশে হয়ত এতক্ষণ ওয়াগন ভর্তি হয়ে বন চলেছে—

হ্যাঁ, গাড়ি চড়ে বনভূমি চলেছে নদী-মাঠ পেরিয়ে নিরাপদ অঞ্চলে। মণিলালের পকেটের মধ্যে তারই ফোটো রয়েছে, হেড-লাইন লিখতে হবে। ছবি দেখে সে চমকে উঠেছিল—শুধু গাছই নজরে পড়ে, যারা সেগুলো মাথার উপরে ছাতার মতো ধরে ওয়াগনে জড়সড় হয়ে বসে আছে, তাদের খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ছবিতে এরোপ্লেন নেই—কিন্তু আছে তারা কোথাও—হিংস্র সতর্ক দৃষ্টি মেলে মেঘের মধ্যে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের ফাঁকি দিতে হবে। বন-জঙ্গলের 'পরে এরোপ্লেনের রাগ নেই, কিন্তু মানুষ পেলে আস্ত রাখবে না।

তাসের আড্ডা থেকে হল্লা ওঠে—গ্রাণ্ড স্লাম! উৎসাহ উত্তাল হয়, কান পাতা দায়। বিরক্ত হয়ে মণিলাল একেবারে কোণে গিয়ে বসে, বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। কয়লার দেশের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলেছে। সারাদিনের পরিশ্রমে এক একবার তার চোখ বুঁজে আসে। অন্ধকারে আবছা-আবছা কয়লার স্তূপ, ট্রলি লাইন, মাঝে মাঝে বয়লারের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা আগুনের হল্কা···সমস্ত মিলে মিশে দেখাচ্ছে যেন ট্রেঞ্চের সারি, ধাবমান শত সহস্র শেল। খোলা মাঠে মৃত্যু কালো পাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়েছে। এ কি রূপ! ১৩২৭ সনে লণ্ঠনের আলোয় যে কথা বলে বলে মেঠো চাষীদের সে পাগল করে তুলত, আজ এই আঠার বছর পরে সত্যি সত্যি যদি তাই দেখা যায়! মণিলাল চোখে চশমা নিয়েছে, বছর বছর চশমা বদলাতে হয়, ডাক্তারেরা বলেন—অত্যন্ত ভয়ের কথা···কিন্তু এখনো তো অন্ধ হয়ে যায় নি—হয়তো এই দেখবার জন্যই অন্ধ হয়নি। হাজার হাজার মানুষ নিঃশব্দে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, আকাশের দিকে চেয়ে দাঁত দিয়ে পাউরুটি ছিঁড়ছে, আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে দেবতার করুণা নয়—বোমা, বিযাক্ত গ্যাস। আকাশের মেঘ জল দেয় না, দিচ্ছে আগুন।

পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালে না—ঢালছে আগুন। বাংলার যুবা প্রেম করছে না, কবিতা লিখছে না, ট্রেঞ্চের মধ্যে বিনিদ্র রাত্রি বসে কাটায়। বন্দুক হাতে মেয়েরা ছেলেদের পাশে···বাঘের মতো চোখ জ্বলছে—রক্তে আর জলে কাদায় চারিপাশের মাটি ভিজে জবজবে হয়ে গেছে।

বাড়িতে পা দিয়ে মণিলাল আশ্চর্য হয়ে গেল। অন্যান্য দিনের মতো অন্ধকার চুপ-চাপ নয়। বাইরের ঘরে দারোগা বসে। দারোগা চেনা লোক, ছেলেবেলায় এই গ্রামে থেকে পড়াশুনা করতেন, অনেকেরই সঙ্গে পাতান সম্পর্ক। আরও দু-চারজন আছেন। চীনা সাহেবের হাতে হাতকড়ি দেওয়া, অঙ্গে প্রহারের দাগ।

দারোগা বললেন, এই যে, এসে পড়েছ মণি-দা। বেটা খুনে, তোমার ছেলেকে—

সে কি?

দারোগা বললেন, না, খুন করে ফেলে নি। মাথা ঘুরে পড়েছিল, এখন ভালই আছে। সে যাই হোক, একটা কিছু হতে তো পারত! এই বেটা, কি নাম রে তোর?

ঈ-হিং—

বিকৃত উচ্চারণ, সহজে বোঝা দায়।

দারোগা হো-হো করে হেসে উঠলেন। তবেই দেখ। যেমন নাম, তেমনি আকৃতি। সাত সমুদ্দুরের দেশ থেকে এসেছে—কিসের খাতির?

মণিলাল ব্যস্ত হয়ে বাড়ির মধ্যে গেল নিতুকে দেখবার জন্য। খানিক পরে ফিরে এল। বলে, ছেড়ে দাও হে—যে রকম শুনলাম, এ তো একটা পাগল—

আর যাঁরা ছিলেন তাঁরাও সমর্থন করলেন, তাই দিন দারোগাবাবু। হয়েছেও তো খুব!

দারোগা বলতে লাগলেন, সমস্ত ভিরকুটি মশায়, আমি হলপ করে বলতে পারি। নইলে দেখুন না—আপনারাই কত বোঝালেন, একটা কিছু সম্মান রেখে চলে যা। একটা বে-আইনি কাজ যখন করে বসেছিস···নগদে না পারিস, না হয় দুটো চাদর রেখে যা—একটা গেরস্তর, একটা আমার। তা বেটা যেন গিঁট দিয়ে বসেছে।

মণিলাল বলে, কি হবে নাস্তানাবুদ করে? ছেড়ে দাও।

দারোগা বললেন, আরে ভাই, সেই বিকেলবেলা থেকে পড়ে আছি—এ কি শুধু তিথিধম্ম করতে? কনেষ্টবলও গোটা দুই এসেছে, তাদের পাওনা মিটিয়ে দিক—দিয়ে যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যাক। আর না হয়—তুমি যখন এত বড় সুহৃৎ, তুমিই দিয়ে দাও।

মণিলাল সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়াল।

কোথায় চললে? বস, বস—

মণিলাল বিরক্তমুখে বলল, দেখি, ছেলেটা তো আধমরা হয়েছে—ছেলেটার মার হাতে চুড়ি-টুড়ি কি আছে। বন্ধক দিয়ে তোমাদের পাওনা-গণ্ডা মেটাই।

দারোগা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

খুব বলেছ, যা হোক। লাটসাহেবের ভয় করি নে—ভয় করি তোমাদের। আবার হয়তো খবরের কাগজে লিখে বসবে। ওরে বাপু, যা—চলে যা—

হাতকড়ি খুলে দেওয়া হল। ঈ-হিং কারও দিকে না চেয়ে মাথায় বোঝা তুলল। হঠাৎ তীব্র আওয়াজ উঠল বাইরের দিকে। মাথার বোঝা ধপ করে ফেলে দিয়ে সাহেব বসে পড়ল।

কি হল রে?

ঈ-হিং যাবে না, কিছুতে যাবে না। বাইরের দিকে আঙুল দেখায় আর

যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। দারোগা বললেন, এক কাণ্ড হয়েছে মণি-দা—কল বিগড়ে এক উড়ো-জাহাজ ধানবনে কাত হয়ে আছে। সন্ধ্যে থেকে এইরকম ঘ্যানোর-ঘ্যানোর চলছে। আর বেটা কি রকম ভীতু দেখেছ? কি রে, যাবি নে তুই? ও এরোপ্লেন, দত্যি-দানা কিছু নয়—

মণিলাল বলল, দৈত্য ছাড়া কি! তার এক এক গ্রাসে একশ' জনকে ঘায়েল করে। সে চেহারা আমরা কেউ দেখি নি—ও হয়তো দেখে এসেছে।···কি রে, দেশ থেকে কদ্দিন এসেছিস?

একটুখানি সে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর বলতে লাগল, পৃথিবী নিষ্ঠুর বলে আমরা আকাশের দিকে তাকাতাম। আকাশও এখন বিরূপ হয়েছে!···কি রে সাহেব, ভয় করে তো থাক্ এইখানে পড়ে।

দারোগা হাসতে হাসতে বললেন, থাকুক। কিন্তু জিনিষপত্র সামাল করে রেখো, ভাই। ওই নিয়ে কাল যে আবার ডাকাডাকি করবে, সে হবে না—

মাঠ ভরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। মাঝে মাঝে এরোপ্লেনের আওয়াজ দিচ্ছে, ঘুমের মধ্যেও কানে আসে। মণিলাল ভাবল, সকাল-বেলা পাইলটের সঙ্গে আলাপ করে খবর নিতে হবে, কোথায় যাচ্ছিল—কি বৃত্তান্ত। একটা প্যারাগ্রাফ লেখা যাবে।

খুব ভোরবেলা জানালার ওধার থেকে চাপা গলায় কে ডাকে, মায়ি!

কে? নীলিমা চমকে উঠে বসল।

চীনা সাহেবের মুখ দেখা যায়। মুখখানা বড় ম্লান। বলে, মায়ি, ভুখ আছে—

নীলিমা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, দূর,—দূর হয়ে যা—

মণিলাল বলে, অমন করতে নেই। কাল রাত্তিরে খায় নি—দাও না কিছু।

নীলিমা বলে, খাবার সস্তা নয়। জন্তু-জানোয়ারকে খাওয়াতে পারব না। বোঝ দিকি, খোকার যদি চোখেই লাগত—

কিন্তু দোষ কার? ওদের কি জগতের কোনখানে টিকতে দেবে না?

ঈ-হিং করুণ চোখে দাঁড়িয়ে আছে।

মণিলাল বলল, সাহেব, একটা চাদর আমায় দেবে? দাম কত?

সাহেব বলল, তোম আচ্ছা আছে। তুমারে পাঁচ লুপেয়ামে দোব।

নীলিমা মুখভার করে বলল, চাদর তো কোন দিন গায়ে দেও না। দয়া হয়ে থাকে সোজাসুজি দিয়ে দাও—ভাণ করছ কেন?

দয়া? না নীলিমা, দয়া নয়—ওদের হিংসা করি। গভীর স্বরে মণিলাল বলতে লাগল, এই যে জিনিষ ফিরি করছে, একশ' রকম লাঞ্ছনা পাচ্ছে—তবু নিজের দেশে ওরই বাপ-ভাই-বোন বন্দুক ঘাড়ে মাথা উঁচু করে বেড়াচ্ছে। নিজের দেশের মাটির উপর দম্ভ করে পা ফেলে বেড়ানো—কতকাল আমরা ভুলে গেছি। আমাদের সে ভাগ্যি নেই।

তারপর নিতুর বিছানার দিকে তাকিয়ে ডাকে, ওরে খোকা, ওঠ্ ওঠ, এরোপ্লেন দেখিগে চল্। আর ঈ-হিঙের সঙ্গে ভাব করতে হবে—

রাগটা তুলে ফেলে মণিলাল হো-হো করে হেসে উঠল। নিতু নেই, পাশবালিশ। বলে, কি রকম শয়তান হয়েছে, দেখ! কোন্ ভোরে পালিয়েছে,—ধরা না পড়ে, তাই পাশবালিশ রাগ চাপা দিয়ে রেখেছে।

নীলিমা সভয়ে বলল, আবার হয়তো মারামারি বাধাতে গেছে। তেমন ছেলে নয়—কাল ঢিল খেয়েছে, মনে মনে তাই পুষে রেখেছে, ভোর না হতে তরে শোধ দিতে গেছে। এবারে চীনেবেটার হাতে খুন হয়ে যাবে—

নীলিমা ব্যাকুল হয়ে বাইরে গেল। মণিলালও গেল। চীনা সাহেবের খোবাট্টা রয়েছে, কিন্তু তাকে দেখা গেল না। নিতুও নেই। গেল কোথায়?

অবশেষে সন্ধান হল। পাড়ার এদিক-ওদিক খুঁজে বোধনতলার কাছে এসে দেখে, খোয়ার গাদার উপর দাঁড়িয়ে আছে আধ-পাগলা ঈ-হিং, ছেলের দল তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ভাব করিয়ে দেবার আবশ্যক হল না—ইতিমধ্যেই তারা অভিন্ন-হৃদয় হয়ে গেছে। ছেলেরা সাকরেদ, ঈ-হিং দলপতি। এরোপ্লেনের দিকে মুষলধারে খোয়া ছুড়ে মারছে—অতদূর অবধি অবশ্য পৌঁছচ্ছে না—কিন্তু চাটুজ্জে মশায়ের পয়সা খরচ করে ভাঙানো খোয়ার স্তূপ প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল। ঈ-হিং মহোৎসাহে দেখিয়ে দিচ্ছে—হুঁ হুঁ, এইসা—এইসা—

নীলিমা বলল, দেখ, দেখ বজ্জাতগুলোর কাণ্ড—

যেও না। মণিলাল স্ত্রীর হাত টেনে ধরল। বলে, করুক ওরা; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুখানি দেখে নাও। এরোপ্লেন চড়ে দস্তিপনা করতে পারবে না, তখন অন্তত গুঁড়ো করে দিক তাকে। মাথার উপর দিয়ে উপহাস করে উড়ে যাবে, সে কিছুতে হবে না।